ভারতের নারী

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
প্রণীত

নূতন সংস্করণ
(পরিবর্দ্ধিত)

আর, ক্যাম্ব্রে এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
১৩৩৩

মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

প্রকাশক

শ্রীসত্যেন্দ্র চন্দ্র কর,

আর, ক্যাম্ব্রে এণ্ড কোং

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক,

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার,

সূর্য্য-প্রেস,

৩৩নং গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

জগদ্ধাত্রী জগদম্বার অর্চ্চনায় বিক্রয়লব্ধ অর্থ উৎসর্গ-মানসে আর্য্য-কন্যাগণের জন্য 'ভারতের নারী' প্রকাশিত হইল।

বর্ত্তমানে শাস্ত্রানুবাদ ও আদর্শ উচ্চভাব লইয়া অনেক পুস্তক নারী-শিক্ষার উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ অলোচনা নাই। আমি এই পুস্তকে দৈনন্দিন জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক অবশ্যপালনীয় বিষয় বিশদরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি; এবং অধুনাপ্রচলিত আচার ব্যবহারের যথাসম্ভব দোষগুণ আলোচনা করিয়াছি। পরিশেষে দশটী আদর্শ ভারতের নারীর পুণ্যচরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনের যে অংশটী সর্ব্বাপেক্ষা মহিমময় সেই অংশই যথাসম্ভব পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সামাজিক ও নৈতিক দুই একটী জটিল প্রবন্ধ লিখিতে ভাষা ও ভাব অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়াছে; আমার ভরসা স্ত্রীজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুধীগণ তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীগণকে এই পুস্তক অধ্যয়নে সহায়তা করিবেন।

পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বঙ্গদেশের বর্ত্তমান মনীষিগণের মধ্যে অনেককে দেখাইয়াছিলাম. তাঁহাদেরই উৎসাহে পুস্তকখানি প্রকাশে সাহসী হইলাম।

আমার অন্যতম অগ্রজ সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কুমুদেন্দু ভট্টাচার্য্য কাব্য-রত্নাকর মহাশয় প্রবন্ধগুলি সর্ব্বতোভাবে সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন; এবং কনিষ্ঠ শ্রীমান্ কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য, এম.এ., বি.এল্. জীবনী সঙ্কলনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। ইঁহাদের যত্ন ও সহানুভূতি না থাকিলে পুস্তকখানি সাধারণ সমক্ষে বাহির করা অসম্ভব হইত। ইতি—

আড়বালিয়া,
সন ১৩২৬ সাল

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ "ভারতের নারী"র বিক্রয়লব্ধ অর্থ মায়ের পূজায় ব্যয়িত হয়। এ সংস্করণেরও গ্রন্থকারের লভ্যাংশ মায়ের পূজার জন্য উৎসর্গ করা হইল। অর্থাভাবে আজ পাঁচ বৎসর পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় নাই। পুস্তকখানি প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে খুব আদরের সহিত সকলে ক্রয় করিয়াছিলেন। এ বৎসর গ্রন্থকার মেসার্স আর, ক্যাম্ব্রে কোম্পানির অন্যতম সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র কর মহাশয়ের নিকট পুস্তকখানি পুনঃপ্রকাশের বাসনা জানাইলে তিনি সাগ্রহে ইহা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকারকে চিরবন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ করেন।

এ সংস্করণে গ্রন্থকার নূতন তথ্য বিশেষ কিছু সন্নিবেশিত করিতে না পারিলেও পাঠিকাগণের জন্য "দুর্গা-স্তোত্র" "স্বাস্থ্যরক্ষা" "দ্রৌপদীর জীবনী" এবং পরিশিষ্টে "শ্রীঅরবিন্দের পত্র," শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র কুমার ঘোষের "মায়ের কথা" ও কমলাকান্তের পত্রাবলী হইতে দুইটী প্রবন্ধের আংশিক উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান মনীষিগণের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মতামত কি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই পুস্তকখানি মাতৃজাতি গঠনের কিঞ্চিৎ সহায়ক হইলে গ্রন্থকার ও প্রকাশকের শ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইবে। ইতি—

আড়বালিয়া,
১লা আষাঢ়, ১৩৩৩ সাল।

গ্রন্থকার।

ভারতের নারী

সূচী

(প্রথম ভাগ)

অবতরণিকা

(দ্বিতীয় ভাগ)

সতী কথা

(তৃতীয় ভাগ)

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচী

ভারতের নারী

শ্রীশ্রীদুর্গা।

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্ন-রাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥

দুর্গা স্তোত্র

জয় দুর্গে জগন্মাতঃ প্রণমামি শ্রীচরণে
ভক্তি দাও পদাম্বুজে জনমে মরণে রণে।
শক্তি দে মা শক্তিরূপা অবলারে দে মা বল
অবলা-কলঙ্ক লয়ে বাঁচিয়া মা নাহি ফল।
আত্মরক্ষা ধর্ম্মরক্ষা সমাজের রক্ষা তরে
দেহ মন বাহুতে মা বল দেগো দয়া করে।
কৌমারী রূপ সংস্থানে কন্যারূপে সেবাব্রত
পালন করিয়া ধন্য হই যেন মনোমত।
রূপ দাও স্বাস্থ্য দাও দাও স্বাস্থ্যরক্ষা মতি
স্বাস্থ্যরক্ষা উদাসীনা ভারত নারী দুর্গতি।
যশ দাও ভাগ্য দাও দাও মনোমত বর
পতি মনোমত হ'তে শক্তি দেমা তার পর।
সহ-ধর্ম্মিনীর ধর্ম্ম পালি যেন ধন্য হই।
কখন ভুলেও যেন পতি প্রতিকূলা নই।
সন্তান পালন শক্তি গণেশ জননী দেমা
দেশারাতি মারি রণে সে শকতি দেমা শ্যামা।
জননী জনম ভূমি মায়ের অধিক মাতা
স্বর্গাদপি গরীয়সী না ভুলি যেন সে কথা।

ভারতের নারী

(প্রথম ভাগ)

অবতরণিকা

অবতরণিকা

লীলা-খেলা

লীলা—লীলা—খেলা—খেলা, স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল জুড়িয়া নিত্য এই লীলা-খেলা। লীলা—ভগবানের, খেলা—সংসার খেলা মানুষের। খেলা খেলিতেই সংসারে আসা।

"অধিকারী একমাত্র অখিল পালক
আমরা সকলে তাঁর যাত্রার বালক॥"

এই সংসার যাত্রার অধিকারী অখিল পালকের ইঙ্গিতে চলিতে পারিলে আমরা সোনার সংসার গড়িতে পারি।

ভারত যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের মূর্চ্ছা হইল। কি ভয়ঙ্কর কথা! সামান্য রাজ্যের জন্য খুড়া, জ্যেঠা, দাদা মহাশয়, দাদা, ভাই, শ্যালা সম্বন্ধীর প্রাণনাশ করিতে হইবে! অর্জ্জুনের সখা অখিলপালক কৃষ্ণঠাকুর বলিলেন—"বাজে ভাবনায় মাথা ঘামাও কেন ভাই—ওদের সকলকেইত আমি আগেই

মারিয়া রাখিয়াছি, এস সখে এস—তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। ভাবনার ভার আমায় দিয়া, কর্ম্মফল এই রাঙ্গা পায় ঢালিয়া দিয়া কাজ করিয়া যাও—সুখ শান্তি তোমাদের ক্রীড়া-দাসী হইবে।

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"—হে ভগবন্, তুমি আমার হৃদয়ে আছ, তুমি যাহা করাইবে আমি তাহাই করিব—ইহাই যদি আমাদের মূলমন্ত্র হয়, এই মহাবাক্যই যদি আমাদের গন্তব্যপথের ধ্রুবতারা হয়, তাহা হইলে আমরা কখনই পথভ্রষ্ট হইব না; তাহা হইলে এ সংসার সমুদ্রে আমাদের তরণী কখনই বিপন্ন হইবে না। আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাদের নিয়ন্তা, আমাদের পরম পিতা সর্ব্বদাই আমাদের ক্ষমা করেন। তিনি শুধু শাসন করেন না, তিনি পালনও করেন; তিনি কেবল বিচার করেন না, স্নেহও করেন; তাঁহার করুণা যদি সকলের নিকট না পৌঁছাইত, যদি সব সময়ে সমভাবে না বহিত, তাহা হইলে পাপী নিস্তার পাইত কিসে? তিনি করুণাময় না হইলে কে এত পাপরাশি সহ্য করিত?

মা সকল! ষষ্ঠীজাগরবাসরে বিধাতা যে লেখা কপালে লিখিয়া যান, হরি, শঙ্কর, ব্রহ্মাও তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। এই ষষ্ঠীজাগরবাসরেই অর্জ্জুন যাত্রার পালায়

অখিল পালক অর্জ্জুন হস্তে, ভীষ্ম, কর্ণ, জয়দ্রথাদির বধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে নিমিত্তমাত্র হইতে আহ্বান করা হইয়াছে। সংসার খেলার কর্ত্তা ভগবান্ যেরূপ খেলিতে দিবেন সেইরূপ খেলা খেলিয়া যাও। যন্ত্রী যন্ত্রকে যেরূপ চালাইবেন যন্ত্র সেইরূপ চলুক। চালাইবার ভার চালকের উপর দিয়া তুমি সুখে চলিয়া যাও—সংসার পথে চলিতে ভাবনা চিন্তা আর তোমাকে অধীর করিতে পারিবে না—বড় সুখে বড় শান্তিতে জীবন কাটিবে।

তোমারা রূপ গুণ শক্তি লইয়া সোনার সংসার গড়িয়া তুলিলে লোকে তারিফ করিয়া তোমাদিগকে বলিবে "রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।" পালনকর্ত্তার এই মহিষী দুটাই পালনকার্য্যের সহকারিণী। চৌষট্টি কলার অধিষ্ঠাত্রী মা সরস্বতীর পূজা যদি তোমরা না কর, তবে সংসার যে বড় আলুনি হইয়া উঠিবে। বাণীর কৃপা ভিন্ন যে চিত্ত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে না। তাই--চাই প্রকৃত শিক্ষা।

আর আমাদের মা লক্ষ্মী যে কেবল রূপেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাহা মনে করিও না। তিনিইত সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—প্রীতিপবিত্রতার উৎস—পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, সুগৃহিণী-পণার কর্ত্রী তাঁহার কৃপাতেই লক্ষ্মীর সংসার—তাঁহার

অকৃপাতেই সংসার অলক্ষ্মীর পুরী। সুতরাং মা লক্ষ্মীর পূজাও ভাল করিয়া করা চাই।

আর চাই শক্তি আরাধনা। শক্তির সাধনা করিলেই শক্তি পাওয়া যায়। নতুবা সমস্ত কাজই বৃথা। শক্তি ও ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিয়া গেলে সকল কাজই আনন্দের হয়। তখন নিজেকে যেমন করিয়া গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা তেমন করিয়া গড়া যায়। অবশ্য ভগবানের ইচ্ছার উপর সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কাজই নির্ভর করে।

ভারতের বিবরণ

সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কত পৃথিবী, কত চন্দ্র, কত সূর্য্য আছে তাহা এখনও মানুষ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা একটী পৃথিবী, একটী সূর্য্য ও একটী চন্দ্র দেখিয়াছে, কিন্তু সেই একটি চন্দ্র সূর্য্য কতটুকু কাজ করে তাহাও বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয় নাই। তবে তাহারা এই পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল বাহির করিয়াছে এবং তাহা নূতন ও প্রাচীন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নূতন

ভাগটী প্রথমে জানা ছিল না, মাঝি কলম্বস উহা আবিষ্কার করিয়া আমেরিকা নাম দেন। প্রাচীন ভাগে এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওসিয়ানিয়া এই কয়টী মহাদেশ। এই এসিয়া মহাদেশেই আবার বারটী দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ একটী। এই ভারতই আমাদের দেশ।

শকুন্তলার পুত্র ভরতের নাম হইতে আমাদের দেশের নাম 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে। আমাদের দেশের মত দেশ পৃথিবীর কোথাও নাই। কোনও দেশে হিমালয়ের মত পর্ব্বত নাই, কোনও দেশে সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতীর মত সুন্দর সুন্দর নদ নদী নাই। রূপে-গুণে ভারতের মত স্থান কোথাও নাই। ভারতে যাহা নাই, তাহা কোথাও নাই। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নিবদ্ধ। এই মহাভারতে যাহা নাই, তাহা কোথাও নাই। এই ইতিহাস পাঠে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ও সতী-সাধ্বীগণের সব কথাই জানিতে পারি।

আমাদের ভারতমাতা মস্তকে (উত্তরে) হিমালয় পর্ব্বতকে মুকুটস্বরূপে রাখিয়াছেন, তাঁহার চরণে (দক্ষিণে) ভারতমহাসাগর লুটিতেছে, পশ্চিমে আরবসাগর, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর তাঁহার চরণ উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে, মধ্যে বিন্ধ্যপর্ব্বত

মেখলার ন্যায় শোভা পাইতেছে, সেই মেখলায় যেন তিনি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত উত্তর ভাগকে আর্য্যাবর্ত্ত ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণের দেশকে দাক্ষিণাত্য বলে। এখানে আর্য্য, অনার্য্য, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি লইয়া তেত্রিশ কোটী লোকের বাস। বোধ হয় প্রকৃতিদেবী নিজের মনোমত করিয়া ভারতমাতাকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী করিয়াছেন।

আর্য্যদেব মধ্যে যাহারা ভারতের পঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধু নদের ধাবে প্রথমে বাস করেন তাঁহারা হিন্দু নামে অভিহিত। সেই হিন্দুজাতি ক্রমে ক্রমে ভারতের সব স্থানে জল জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বসতি করিতে লাগিলেন, এবং পরে তাঁহারা সংসার ও সমাজের সুবিধার জন্য চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা অধ্যাত্ম লইয়াই থাকিতেন এবং সকলের মধ্যে ভগবানকে মূর্ত্ত করিয়া সকলকেই আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া জগতকে সচ্চিদানন্দের অধিকারী করিতে লাগিলেন, তাঁহারা হইলেন ব্রাহ্মণ। সংসারের কাজ হইল ইহাঁদের বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া, সকলের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা। যাঁহারা ব্রাহ্মণের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ এবং যাঁহারা রাষ্ট্র ও সমাজকে অনার্য্যের হাত

হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, তাহাদের নাম হইল ক্ষত্রিয়। যাঁহারা ঐ আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লোকস্থিতির জন্য সমাজের পুষ্টিসাধনে তৎপর এবং ব্যবসা বাণিজ্যে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল বৈশ্য। আর এই তিন জাতির কর্ত্তব্যের প্রতিদান করিয়া ভূমানন্দে অধিকারী হইবার জন্য ইঁহাদের সেবায় যাঁহারা অগ্রসর হইলেন তাঁহাদের নাম রহিল শূদ্র। তখন চতুর্ব্বর্ণের সকলেই সমভাবে সমাজের সেবা করিতে লাগিলেন, কেহ কাহাকেও হীন বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

ভারত আগে হিন্দুদের ছিল, পরে মুসলমানগণ তাহাতে কর্ত্তৃত্ব করে, এখন ইংরাজের অধিকারে আছে।

হিন্দুগণই প্রথমে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার চর্চ্চা করেন, আর জগতকে জ্ঞান গরিমা বিতরণ করেন। ভারতই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জননী; ভারতের বিদ্যা, ভারতের সাধনা, ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের সতীত্ব বহুপূর্ব্ব হইতেই বিকাশ পাইয়াছিল। এখনও ভারত বহু বিষয়ে সকল দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মপালন যে ভাবে করিয়াছেন, এখনও তাহা সকলের যেন চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে। আজিও সকলে বলে 'যেন রাম-রাজত্ব'। রামের পত্নী সীতা যেরূপ সতীত্বধর্ম্ম জগৎকে

দেখাইয়াছেন, তাহা কোন দেশ কোনকালে দেখে নাই। সাবিত্রী মৃত স্বামীকে বাঁচাইলেন—জগতে কোথায় কে এ দৃশ্য দেখিয়াছে? কোন্ দেশেব বেহুলা গলিত স্বামীকে বাঁচাইয়াছেন? কোন্ দেশেব 'সতী' স্বামিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করেন? দময়ন্তী, লীলা, চূড়ালা, রন্তিদেবী, দ্রৌপদী, চিন্তা—রাজকন্যা হইয়াও স্বেচ্ছায় কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। স্বামী অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারী চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেও অন্ধ হইযাছিলেন। বাজপুতনার ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সকল স্ত্রীলোকই স্বামী পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইয়া অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া বাখিতেন; স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাইলেই নিজেরা অগ্নিতে প্রবেশ কবিতেন। স্বামীর সহিত এক মন প্রাণ ছিল বলিযাই তাঁহাবা সহমবণে যাইতে ভীতা হইতেন না। কোন্ দেশে মূর্ত্তিমতী সতী "সতী" নিজের দেহখানি বায়ান্ন খণ্ড কবিযা চাবিদিকে ছড়াইয়া সমস্ত দেশ-টাকে একটা গণ্ডীব ভিতব বাখিয়াছেন—পাছে পাপ স্পর্শ করে! কোন দেশেব সতী স্বয়ং যমেব নিকট হইতে স্বামীকে ফিরাইয়া আনে? অনন্ত কষ্টের মধ্যে অযথা পীড়নেব মধ্যে তিলমাত্রও ভক্তিহীনা হয় না?—বিধাতার আশীর্ব্বাদে তাঁহার পুণ্য-মহিমায় এদেশ সতীর খনি! কতক কালমাহাত্ম্যে কতক আমাদেরই কুশিক্ষার দোষে স্থলবিশেষে ব্যভিচার

দেখা যায়, কিন্তু সতী-অঙ্গের পুণ্য পীঠস্থানের ধূলি অনেক পাপ দূর করিতেছে, ভাগীরথীর পবিত্র সলিলের মত সমস্ত কলুষ ধৌত করিতেছে।

নারীর আবশ্যকতা

বিশ্বসৃষ্টির সর্ব্ব আদর্শের সারভূতা রূপে ভগবান্ নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে জগদ্‌বন্ধনের সমুদয় উপাদান আমরা নারী-জাতির মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। প্রকৃতি বিশ্বজগতের বন্ধন—নারীর অন্য নাম প্রকৃতি। বিশ্ব-প্রসবিনী আদ্যাশক্তির অংশরূপে তাঁহাদের জন্ম, সেই-জন্য জগৎ স্ত্রীজাতিকে মাতৃচক্ষে দেখে। জগতে সর্ব্বসন্তাপ হরণ করিতে মার ন্যায় কে আছে? মাতৃগর্ভে স্থানপ্রাপ্তির পর হইতে পূর্ণ জীবন কাল আমরা অশেষপ্রকারে তাঁহার যত্নে রক্ষিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হই। কবিতার চক্ষে অনেক সময় স্ত্রীজাতিকে সৌন্দর্য্যের সারভূতা রূপে বর্ণিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু পুষ্পের সহিত তুলনা করিয়া তাহার মাধুর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; পুষ্পকে বিশ্ব-বনস্পতির বীজরূপে উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। রমণীর

কোলে কমনীয়কান্তি শিশু যে শোভা বর্দ্ধন করে, জগতের সমগ্র অলঙ্কার বা সৌন্দর্য্য তাহার শতাংশের একাংশও প্রকাশ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। সংসার-জীবনে নারীজাতির কর্ত্তব্যপালনের সহিত তাঁহার সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে গেলে শেষোক্তটী একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। নারী, জন্মের প্রথম প্রভাত হইতে সংসারকে মধুর স্নেহ-বন্ধনে বদ্ধ করেন। নারীকে কুমারীরূপে পার্ব্বতী, যুবতীরূপে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, মাতৃরূপে জগদম্বা, প্রৌঢ়ারূপে জগৎপালিকা ও বৃদ্ধারূপে স্বয়ং জগদ্ধাত্রী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রোগে শোকে, দুঃখে-দৈন্যে অভাবে-অভিযোগে মানবের সর্ব্ববিধ অশান্তিতে তাঁহারাই একমাত্র শান্তিপ্রদায়িনী। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন মহিমা কথঞ্চিৎ আলোচনা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

আর্য্যশাস্ত্রে নারীধর্ম্ম

আজ এই দুর্দ্দিনেও ভারত ভারতই আছে ; কারণ আজও ভারতের নারীগণ সর্ব্বত্র পূজিতা। ভারতের পুরুষগণ নারীকে এখনও দেবীভাবে পূজা করে বলিয়াই তাহারা

স্ত্রীজাতিকে বাসনার বিষয়ীভূত করে নাই। পাছে পাপস্পর্শে পুণ্যপ্রতিমা কলুষিত হয় এই ভয়ে তাহারা স্ত্রীলোকের জন্য নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। অন্যদেশ প্রকৃত নারীপূজা জানে না। যাঁহারা 'নারীপূজা'র দাবী করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন, একটু অপক্ষপাত বিচার করিলেই কিন্তু স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তাঁহারা 'নাবীপূজা' না করিয়া সর্ব্বত্রই নারীদের অপহরণ ও অবমাননা করিতেছেন। স্ত্রী-জাতিকে উচ্চাসন দিতে আমাদের ন্যায় অন্য কোন জাতির শাস্ত্র বাস্তবিক পারে নাই ও জানে না। পতিব্রতা নারীর এরূপ গৌরব অন্য জাতি ভাবিতেও পারে না।

আমাদের দেশও যে আজ আদর্শ হইতে কিছু পিছাইয়া পড়ে নাই, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু এই অধঃপতনের মূল কি? তাহা আমবা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব। অশিক্ষিত কাণ্ডজ্ঞানহীন গুরুজনে ভক্তিবিহীন ব্যক্তিরাই তাহাদের স্ত্রীকে বিলাসের পুত্তলি করিয়া তুলে, সেই সঙ্গে দেবী-প্রতিমা বিলাসেব সংস্পর্শে কলুষিত হয়। তাহাদের দেবীপূজার মন্ত্র নাই, সে ধূপধুনা হইতে নরকের পুতিগন্ধই বাহির হয়, সেখানে দেবীপ্রতিমা থাকে না; কেবল আসুরিক পূজার ষোড়শোপচারের ব্যবস্থা।

মনু বলেন:—যে বংশে রমণীগণের পরম সমাদর বা

সম্মান হয়, সে বংশের প্রতি দেবগণ প্রসন্ন থাকেন, আর যেখানে রমণীর আদর নাই, সম্মান নাই সে বংশের যাগ-যজ্ঞাদি কার্য্যও নিষ্ফল হয়। যে বংশে দম্পতী পরস্পরের প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট সেখানে মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

সাধ্বী স্ত্রী আদরগৌরবে হর্ষোৎফুল্ল থাকিলে সমস্ত বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। আর স্ত্রীলোকের অবমাননা হইলে সে বংশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যেখানে গভীর রাত্রে স্ত্রীলোকের দীর্ঘশ্বাস পড়ে সে স্থান অচিরাৎ শ্মশানে পরিণত হয়। রমণীগণ অশেষ মঙ্গলের আস্পদ। সন্তানোৎপাদন ইহাঁদের একমাত্র কার্য্য নহে; রমণী গৃহের শোভা, সংসারের লক্ষ্মী; শ্রীতে ও স্ত্রীতে কোন প্রভেদ নাই। যে মূঢ় পুরুষাধম স্ত্রীলোকদিগের অবমাননা করে সতী পার্ব্বতী পদে পদে তাহার অমঙ্গল করেন।

স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতা বলেন :—পতি বিদেশে গমন করিলে স্ত্রী কোনস্থানে যাওয়া আসা কিংবা বেশভূষা করিবে না; গবাক্ষপথে দাঁড়াইবে না; কোন কার্য্যই স্বামীর আজ্ঞা ব্যতীত করিবে না।

ব্যাসদেব বলেন :—স্ত্রীজাতি কখনও উচ্চকণ্ঠে বাক্যালাপ করিবে না।

গৌতম বলেন :—ধর্ম্মকার্য্যেও স্ত্রীজাতি স্বাধীনা নহে।

শঙ্খ বলেন :—স্ত্রীলোকের কোন স্থানে যাইতে হইলে, গুরুজনের আদেশ লইয়া যাইবেন; পরপুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিবেন না; অনাবৃত দেহে থাকিবেন না।

কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্বন্ধে মনু বলেন :—স্ত্রীলোক সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্তে থাকিবেন; মনোযোগের সহিত গৃহকর্ম্ম করিবেন ও পবিমিত ব্যয় করিবেন।

বহ্নিপুরাণ বলেন :—রমণী শুদ্ধা হইয়া প্রাতে শয্যা হইতে পতিকে প্রণাম করিয়া উঠিবেন। উঠিয়া গৃহ পরিষ্কার করিয়া স্নান করিবেন, পরে, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পতিকে প্রণাম করিয়া দেবতাব পূজা করিবেন। তৎপরে রন্ধন করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইবেন, এবং অতিথি ও অন্যান্য সকলকে খাওয়াইয়া নিজে খাইবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য পালন কিংবা সহগমন করিবেন।

লক্ষ্মী (বিষ্ণুপুরাণে) বলেন :—যে সকল নারী সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, সত্যভাষিণী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, পুত্রবতী, দেবতাগণের পূজাপ্রিয়া, গৃহমার্জ্জনে তৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, ধর্ম্মরতা ও দয়ান্বিতা হয় আমি তাহাতে বাস করি।

কৌশল্যাদেবী রামবনবাসকালে সীতাদেবীকে বলিয়াছিলেন :—বৎসে, যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন

হইয়াও বিপদে স্বামীসেবায় পরাঙ্মুখ হয়,সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে, উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখভোগ করে, এবং বিপদ উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। উহারা মিথ্যা কহে, এবং পতির প্রতি একান্ত বিরাগ বলিয়া অল্প কারণেই বিরক্ত হইয়া উঠে। এই সকল স্ত্রীলোক অত্যন্ত অস্থির চিত্ত ; উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন ভূষণে বশীভূত হয় না, ধর্ম্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ দেখাইয়া দিলে অস্বীকার করে। কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনাদের কুলমর্য্যাদা পালন করেন, যাঁহারা সত্যবাদিনী ও শুদ্ধস্বভাবা, সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন জ্ঞান করেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্ব্বাসিত হইতেছেন, তুমি ইহাঁকে অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই হউন, তুমি ইহাঁকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।

মনু বলেন :—স্বামী রুষ্ট হইলেও স্ত্রীলোক সর্ব্বদা হৃষ্ট থাকিবেন, গৃহকর্ম্মে দক্ষা হইবেন, গৃহ-সামগ্রী সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন এবং ব্যয় বিষয়ে অমুক্তহস্ত হইবেন। পতি সদাচারবিহীন, অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত, বিদ্যাবিহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় তাঁহাকে সেবা করিবেন।

সাধ্বী স্ত্রীর সন্তান না হইলেও তিনি স্বর্গে যাইবার অধিকারিণী।

স্ত্রীলোক ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইলে লোকে নিন্দনীয় হয়, শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং কুষ্ঠাদি মহারোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় ক্লেশ পায়। যিনি পতির সর্ব্বপ্রকার বশীভূতা থাকেন, তিনি স্বর্গে স্বামীর সঙ্গপ্রাপ্ত হন।

স্ত্রীশিক্ষা

স্ত্রীশিক্ষা দোষের নহে কিন্তু স্ত্রীজাতির শিক্ষা পুরুষের অনুরূপ হওয়া উচিত নহে। বর্ত্তমান সংস্কারযুগে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি একমাত্র আদর্শস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এ জগৎ শিক্ষাক্ষেত্র, মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন চিন্তা ও কার্য্য-প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া একান্ত শিক্ষাসাপেক্ষ। শিক্ষা শব্দে কতকগুলি পুস্তকপাঠ বা সীমাবদ্ধ রীতিনীতি আলোচনা একমাত্র লক্ষ্যস্থল নহে। যে—যে পথের পথিক তৎসম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য; সুতরাং সেমিজ, বডি পরিয়া কলেজাদিতে অধ্যয়ন না করিলে যে তাঁহাদের শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য

সমীচীন নহে। একজন সুবিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার যদি সেক্স্পিয়ার বাইরণে অনভিজ্ঞ হন তথাপি তাঁহাকে অশিক্ষিত পদবাচ্য করা যাইতে পারে না। সেইরূপ সংসারধর্ম্মে অভিজ্ঞা, সন্তানপালনতৎপরা ও স্বামিসেবাপরায়ণা, সাধ্বী রমণী নিরক্ষরা হইলেও বোধহয় অশিক্ষিতা পদবাচ্যা হইতে পারেন না। একটী কথা উঠিতে পারে—গ্রন্থাদি পাঠ ব্যতীত উক্ত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ না হইতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, স্ত্রীজাতি স্বাধীনা নহেন। সর্ব্বসময়েই তাঁহারা পুরুষের অনুবর্ত্তিনী। সুতরাং শিক্ষিত চরিত্রবান্ স্বামীমাত্রেই সচেষ্ট হইলেই সহজেই সে শিক্ষা দান করিতে সমর্থ হয়েন। আজ কাল আমরা দেখিতে পাই, সঙ্গতিপন্ন ভদ্র গৃহস্থপরিবারে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে পুর-স্ত্রীগণ সংসার-কর্ম্মে নিতান্ত অপটু হইয়া উঠিতেছেন। একদিন পাচক-ব্রাহ্মণ অনুপস্থিত হইলে স্বামীপুত্রকে উপবাসী থাকিতে হয়, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? মনুষ্যের উন্নতি অবনতি চিরস্থায়ী নহে, চিরদিন পাচক ও দাসদাসীর দ্বারা সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ সম্ভব নাও হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে সংসার-কার্য্যে অনভিজ্ঞা রমণীর অবস্থা যে কত শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থের গৃহিণীগণ কার্য্যনিপুণা না হইলে সংসার-ধর্ম্ম

পালন করা অসম্ভবই হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে হিন্দুরমণীগণ সহিষ্ণুতার আধার বলিয়াই বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে হিন্দুসমাজ অটুট রহিয়াছে। তাঁহাদিগের সংসারপালনপ্রথা স্বচক্ষে অবলোকন করিলে কোন সহৃদয় ব্যক্তি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতেই পারেন না। আজ যদি আমাদের ব্যবস্থার দোষে, আমাদের রুচির বিকারে সে পথ হইতে তাঁহাদিগকে বিচলিত করা হয়, তাহা হইলে সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিবে।

স্ত্রী-শিক্ষার অর্থ শুধু ভাষাশিক্ষা বা সাহিত্য চর্চ্চা নহে। নারীর কর্ত্তব্য, নারীআচরণই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষণীয় বিষয়। সংসারধর্ম্মে সম্পূর্ণ শিক্ষিতা একজন নারী—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন এম, এ পাশ, ডাক্তারি পরীক্ষার এম, বি পাশ অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। খানকয়েক গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া তাহাই অবিকল লিখিয়া আসিতে পারিলেই এম, এ পাশ করা সম্ভব হইল। আর স্ত্রী-শিক্ষার এম, এ পাশ—সংসারসম্রাজ্ঞী। সংসার সম্রাজ্ঞী হইতে হইলে, প্রথমে অপরিচিত শ্বশুরকুলে যাইয়া—লজ্জা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য, স্নেহ, সরলতা, সতীত্ব দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিয়া নিজেকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইতে হইবে। তবে সংসারের হিসাব নিকাশ, সদ্‌গ্রন্থ

পাঠ, সাহিত্যাদি চর্চ্চা করিতে যত বেশী জ্ঞানগর্ভ পুস্তকপাঠ করা যায় ততই সমাজ ও সংসারের মঙ্গল।

বিবাহ

শুধু স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন বিবাহের উদ্দেশ্য নহে, উহার মধ্যে অন্য গুরুভাবও সংমিশ্রিত আছে। অন্যান্য আশ্রমের ন্যায় সংসার-আশ্রমও ধর্ম্মসাধনের জন্য। সংসারী ব্যক্তির সংসার রক্ষার মহাব্রতে নিজের ভোগ-সুখের বলিদান দেওয়াই বিবাহের উদ্দেশ্য। হিন্দু দম্পতীর উদ্বেল যৌবন যাহাতে সংযত হয় এবং পরে জনকত্বের গাম্ভীর্য্যে পরিণত হয় তাহারই জন্য উপবাস, মন্ত্র, বিধিব্যবস্থা। হিন্দু দম্পতী যাহাতে মাতা পিতার নির্ব্বাচনে সন্তুষ্ট হইয়া সুখে সংসার করেন এই উদ্দেশ্যে বোধ হয় মাতাপিতা বাল্যাবস্থায় কন্যাদের বিবাহ দিয়া থাকেন। আর বাল্যকাল হইতে যাহাতে শ্বশুর শ্বাশুড়ী বধূকে ইচ্ছামত গঠিত করিতে পারেন এবং তাঁহাদের অবর্ত্তমানে সেই সংসার পূর্ব্বের ন্যায় সুশৃঙ্খলে চলিতে পারে এটীও তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

পূজা, মন্ত্র, উপাসনাদি দ্বারাই স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্মবন্ধনের

মিলন শিবদ হয়। সংস্কারের বশে আমরা মন্ত্রপূত হইয়া যে মিলনের অধিকারী হই, অন্যদেশে রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াও সে মিলনের অধিকারী হয় না বা মিলন চিরস্থায়ী হয় না। বেগবতী নদী যেমন সমুদ্রকে পাইলেই আনন্দে মিলিত হয় এবং তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলীন হয় সেইরূপ হিন্দুনারী স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া তাহার সমুদয় অস্তিত্ব স্বামীর সহিত মিশাইয়া দেন। হিন্দু বিবাহ মন্ত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়েই ভগবান ও দেবতাগণের নিকট মিলন শিবদ হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। পরে পতি পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া বলেন "তোমার হৃদয় আমার হউক এবং আমার হৃদয় তোমার হউক"। পত্নীও অরুন্ধতীকে সাক্ষ্য করিয়া বলেন "হে অরুন্ধতী! তুমি যেমন আকাশে বশিষ্ঠের চির সহচরী তেমনি আমিও যেন তোমার ন্যায় স্বামীসহ চিরদিন মিলিত থাকিতে পারি।" এবং ধ্রুবনক্ষত্রকে বলেন "তুমি যেমন চিরস্থির, আমিও যেন তোমার আশীর্ব্বাদে পতিসনে তোমার ন্যায় অচল অটলভাবে থাকিতে পারি।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে স্ত্রীপুরুষের সম্মিলন চলিয়া আসিতেছিল। ক্রমে ব্রহ্মবাদিনী দলের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ভগবৎআরাধনা করিতেন। কিছুকাল পরে এ সাধনা তাঁহাদের সম্যক উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইল না, জগৎপ্রসবিনীর অংশভূত

হইয়া তাঁহার সৃষ্টি-কার্য্যের সহায়তা না করিলে জীবনই বৃথা, অপিচ ভগবদ্‌ভাবে স্বামী-সেবা করিলে তাঁহাদের সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হইবে, শাস্ত্রের এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা বিবাহ করিয়া স্বামিপদে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

জীব মাত্রেরই প্রবৃত্তি প্রবল। এই প্রবৃত্তি (বাসনা) দমনই মনুষ্যত্ব। নতুবা মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি? এই প্রবৃত্তি স্রোতে ভাসিয়া না যাওয়াই ভারতবর্ষের আর এক বিশেষত্ব। যাহাতে পাপ সংস্পর্শে স্ত্রী কি পুরুষ না যায়, এইজন্যই কন্যা ও পুত্রগণের যৌবন-বিকাশের পূর্ব্বেই মাতাপিতা বংশ ও গুণ দেখিয়া পুত্র কন্যাকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করেন।

এখন স্ত্রালোকেরা স্বামীকে ভগবদ্‌ভাবে না লইতে পারিয়াই মহা বিপদে পড়িয়া 'গেলুম', 'মলুম' চীৎকার করিতেছেন, এবং সেই সঙ্গে নানাবিধ যজ্ঞ পূজার অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমাদের বুদ্ধি বা বিচার-শক্তির দ্বারা শাস্ত্রকে অমান্য করিতে পারি না এবং সেই শাস্ত্রেই আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সকল কর্ত্তব্য যথারীতি দেখিতে পাই। কিন্তু শাস্ত্র মানিয়া চলিলে নিজেদের পাপাভিলাষ পূর্ণ হইবে না বলিয়াই শাস্ত্রের চোখে ধূলি দিয়া বলি ওসব একালের জন্য নহে। কিন্তু শাস্ত্র সনাতন। আমরা জানিয়া শুনিয়া কাম রিপুর বশীভূত হইয়াই যত অন্যায় কার্য্য করি। গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"জীবের পাপাচরণে প্রবৃত্তি না থাকিলেও কে তাকে বলপূর্ব্বক পাপে নিয়োগ করে?" ইহার উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "কামই (বাসনা) সর্ব্বপাপের মূল।

স্বামিপদে মন প্রাণ বিকাইতে হইলে, স্বরূপ কুরূপ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র দেখিবার আবশ্যক হইবে না। স্বামী যেমনই হউন তাঁহাকে ভগবানের বিগ্রহরূপে পূজা করিলেই সকল ইষ্ট লাভ হইবে। স্বর্গীয় প্রেম কামগন্ধশূন্য, তাহার সঙ্গে রূপ-যৌবনের কোন সম্পর্ক নাই। ভগবদ্‌বিদ্বেষী ব্যক্তিরা শত চেষ্টাতেও স্বর্গীয় প্রেম উপলব্ধি করিতে পারে না। (পার্ব্বতী বৃদ্ধ শিবকে স্বামীপদে বরণ করিয়া পত্নীত্বের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।)

সংসার

সংসারধর্ম্ম পালনের উদ্দেশ্যেই বিবাহ। পুত্র কর্ত্তৃক পিণ্ড প্রাপ্তি ইহাও শাস্ত্রকারদের কথা। পিণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলেও —বিচারশক্তির দ্বারা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পুত্র না থাকিলে সংসারী ব্যক্তির সংসারধর্ম্ম পালন করা অপূর্ণ হইল। ভগবান্ তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যের সহায়তাকল্পে সংসার-আশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজে খাইয়া পরিয়া সংসারের মধ্যে থাকিলে, কিংবা ভগবৎ-আরাধনা করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বর্গে গমন করিলে জগতের কি উপকার সংসাধিত হইল? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত আছেনই। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন এই সংসারের সকলকেই

ভগবানরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য। সেইজন্য নিজ স্বামী পুত্রকে ভালবাসিয়া, ভালবাসা জিনিষটা উপলব্ধি করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। পুত্র কন্যা উৎপাদন করিয়া সৎশিক্ষার দ্বারা তাহাদিগকে সর্ব্বগুণে বিভূষিত করাইয়া, দেশের ও দশের কাজ করাইবার উপযোগী করা যায়, তাহা হইলেও মৃত্যুর পর পরমপিতার সহিত মিলিত হইয়া চির-সুখ-শান্তি ভোগ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সন্ন্যাস-আশ্রমে শুধু নিজেরই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে, সন্ন্যাস-আশ্রম অপেক্ষা সংসার-আশ্রম বিপদ্‌সঙ্কুল, পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। এই সংসার-আশ্রমের কর্ত্তব্যকর্ম্ম যাঁহারা পালন করিতে পারেন তাঁহারা সন্ন্যাসী অপেক্ষাও বীর।

আজকাল নীতিবাদীদিগের চক্ষে আপন স্ত্রী-পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান স্বার্থপরতার মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। পরসেবা স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি মহান্ আদর্শের দারুণ নিষ্পেষণে লোকচক্ষে সংসার-পালন বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে ইহাও যে সংসার-মহাব্রতের শ্রেষ্ঠ সাধনা তাহাও স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। সৃষ্টির সহায়-তার জন্যই মানব-সৃষ্টি স্বীকার করিলে, যে কোন প্রকারে— স্বীয় পুত্র-কন্যা রূপেই হউক, অথবা অন্য যে কোন রূপেই

হউক জগৎ পালন করাই ভগবৎ-উদ্দেশ্য সাধন ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মানব ভগবদ্দত্ত শক্তি লইয়াই সংসারকার্য্য করিয়া থাকে। তিনি যাহাকে যে প্রকার শক্তি দিয়াছেন সে সেইরূপ কার্য্যই করিবে। সুতরাং যাহারা তাঁহার পূর্ণ-মুখাপেক্ষী, সর্ব্বপ্রকারে তাহাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা আমার মতে সর্ব্বপ্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

সংসার সম্রাজ্ঞীর কর্ত্তব্য

আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে সাংসারিক কার্য্যের বিধিব্যবস্থা একমাত্র স্ত্রীজাতীর উপরই নির্ভর করে। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সকল সংসারেই গৃহিণীপণা করা একটী সাম্রাজ্য পালনের দায়িত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক নববধূ তাহার কিশোর জীবনেই উক্তপদে বরিত হন। পৃথিবীর সাম্রাজ্য পালন করিবার জন্য সকল দেশে সকলেই যেমন পূর্ণ আগ্রহে সম্রাট্ অথবা সম্রাজ্ঞীর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন, এবং সেই কৃতাভিষেকীকে তাহাদিগের ভাবী সুখ-দুঃখের বিধাত্রী বলিয়া মনে করেন, হিন্দুগণও সেইরূপ বিবাহ-উৎসবরূপ অভিষেকে নববধূকে সংসারের ভাবী কর্ত্রীরূপে পরমাগ্রহে বরণ করিয়া

গৃহে লন। সাম্রাজ্যবাসিগণ তাঁহাদের বরিতা সম্রাজ্ঞীর অভিষেককালীন সামান্য আচরণ হইতেই তাঁহার ভাবী কর্ত্তব্য-পালন বিষয় স্থির করিয়া লন। সেইরূপ নববধূ বালিকা অবস্থায় নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে যখনই শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করেন ও যে কয়দিন শ্বশুরগৃহে থাকেন, সেই কয়-দিনের সামান্য সামান্য আচার-ব্যবহার দেখিয়া গৃহস্থগণ তাঁহার ভাবী গৃহিণীপণার বিষয় স্থির করিয়া লন। সম্রাজ্ঞীর যেমন নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ কৌতুক বিসর্জ্জন দিয়া আশ্রিত প্রজাগণের উন্নতি ও সুখবিধান করা একমাত্র কর্ত্তব্য; সংসার-সম্রাজ্ঞীরও সেইরূপ সর্ব্বস্বার্থ ত্যাগ করিয়া একান্তমনে সংসারস্থ আত্মীয় স্বজন, অনুগত অভ্যাগত সকলেরই তৃপ্তি সাধন করা একমাত্র লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত। সংসারের লোক কেবল মাত্র নববধূর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন না, তাঁহার আচরণ, কথন, চালচলন, ভাবভঙ্গী প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত বা বিরক্ত হন। ভবিষ্যৎ জীবনে যাঁহাকে যেপথ অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, জ্ঞানোদয়ের পর হইতেই তাঁহার সে বিষয়ে সর্ব্ব-প্রযত্নে শিক্ষালাভ করা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। পিতৃগৃহে অবস্থানকাল হইতে সংসারের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির গৃহকর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গীন নিপুণতা লাভ করা উচিত। বিশেষতঃ

আমাদের দেশে বিবাহের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদে কাটাইলে চলে না, বিবাহান্তে সংসারের গুরুভার বহনোপযোগী সমুদয় শিক্ষা পিতৃগৃহে পূজনীয়াগণের নিকট হইতেই বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে হয়। শ্বশুরগৃহে শাশুড়ী প্রভৃতি পূজনীয়াগণের নিকট হইতে অবশ্য শিক্ষা লাভ করিবেন, কিন্তু সে সুযোগ পূর্ণমাত্রায় সকলের না ঘটিতে পারে, শাশুড়ীশূন্য বা কর্ত্রীহীন গৃহেও অনেকের বিবাহ হইতে পারে, সুতরাং পিতৃগৃহ হইতেই এ বিষয়ের শিক্ষা করা সকলেরই উচিত।

বিবাহের সময় সকলে যেমন বড় আশায় হাসিমুখে তোমাকে বরণ করিয়া লইবেন, তোমাব আচরণে তাঁহাদের সে হাসি যেন জীবনে না ফুরায়; যে আশায় তোমাকে সংসারে বরণ করিবেন, তোমার অসদাচরণে তাঁহাদের সে আশা যেন কখনও ভঙ্গ না হয়। শ্বশুরগৃহে আগমন করিলে যখন সকলে নববধূর মুখ দেখিবার জন্য আসে, তখন তোমার মনে যেমন হয়, আমার এ মুখখানি যেন সকলের নিকটই সুন্দর হয়; সেইরূপ তোমার সমগ্র জীবনে তোমার মুখ, তোমার আচরণ, তোমার স্মৃতি যেন সকলের নিকট তুল্য তৃপ্তিপ্রদ থাকে, প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতে হইবে। পাঁচটি লইয়া সংসার, সংসারের পাঁচজন পাঁচরকমের হইতে পারে, তাহাদের আদর্শ লইয়াই তোমার জীবন গঠন করিলে চলিবে না; অপরের

আচার ব্যবহার যেরূপই হউক না কেন, তোমার কর্ত্তব্য যথাসাধ্য তোমার পালন করিতে হইবে। সংসার অনুসারে সংসারের কার্য্যের ব্যবস্থা নানারূপ হইলেও আমরা সংসারের মোটামুটি কয়েকটী কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ করিতেছি।—

প্রত্যূষে অন্যান্য পরিজনবর্গের পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য : সংসারের পূজনীয় বা পূজনীয়াগণ যেন কোনক্রমেই তোমাকে স্বামিসহ নিদ্রিতা দেখিবার অবসর না পান। গৃহ ও অঙ্গনাদি মার্জ্জনান্তে স্নান করিয়া শ্বশ্রূ বা গৃহকর্ত্রীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের আদেশ মত রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইবে, উক্ত কার্য্যের মধ্যেই সন্ধ্যা বন্দনা, দেবপূজাদিও সম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে। সর্ব্বান্তঃকরণে ও বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত রন্ধনকার্য্যাদি সম্পন্ন করা প্রয়োজন ও আহারকালে সকলকে যথাযোগ্যরূপে পরিবেশন ও ভোজনান্তে উহাদিগের আবশ্যক দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বশেষে নিজের আহার করা কর্ত্তব্য। আহারান্তে গৃহের দ্রব্যাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া শ্বশ্রূমাতার প্রীতির জন্য তাঁহার পদসেবা বা পাকাচুল তুলিয়া তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করিবে ও তাঁহাদিগের নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিবে পক্ষান্তরে সদগ্রন্থ পাঠ ভাল। মোটের উপর সংসারের সমুদয় লোক তোমার কাছে যাহা আশা করেন, তোমার সাধ্যমত তাঁহাদিগের সে

আশা পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। সমুদয় সংসারের সুখ শান্তি নিজের সুখ-শান্তি বলিয়া মনে করিও। বিশেষতঃ আশ্রিত ও অনুগত তোমার ব্যবহারে যেন মনঃকষ্ট না পান। আদর্শ গৃহিণী হইতে হইলে পরিশ্রমকাতরা হইলে চলিবে না; পরিশ্রম না করিয়া কে কবে উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে? তোমার যখন আবার পুত্রবধূ হইবে, সংসার সম্বন্ধে তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া, তাঁহারই হাতে সংসারের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ভগবদারাধনা করিতে পারিবে।

স্বামী দেবতা

হিন্দুরমণীর ইহকাল পরকালের একমাত্র আশ্রয় ও গতি—স্বামী। স্বামী তাঁহাদের সর্ব্বময় দেবতা একথা আর্য্যসভ্যতার আদি যুগ হইতে নানাছলে নানাস্থলে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া রঙ্গ-পরিহাসমূলক গ্রন্থাদিতেও ভূয়োভূয়ঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অদ্যাপি হিন্দু মাত্রেই তাঁহাদের স্ব স্ব কন্যা, কনিষ্ঠা ভগ্নী বা অন্যান্য বয়ঃকনিষ্ঠা প্রতিপাল্যাগণকে একথা যে শতাধিক বার বলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে আমাদের এ প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন কেন? তাহার উত্তরে

আমরা এই বলি—প্রাচীন যুগে কুশাগ্রমতি আর্য্যঋষিগণ অনেক গ্রন্থে মূল সূত্র মাত্র রচনা করিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কালবিপর্য্যয়ে আমরা এত অল্পমেধস যে ভাষ্য ও টীকা ব্যতীত এখন তাহা বোধগম্য হয় না বা নিজে নিজে বুঝিতে গিয়া কদর্থ করিয়া বসি। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও "স্বামী সর্ব্বময় দেবতা" এই মূল সূত্রের টীকা প্রয়োজন হইয়াছে। বাল্যকাল হইতে মানব-শিশুর সম্মুখে শিক্ষার যে আদর্শ স্থাপন করা যায়, প্রকৃতিগত ধর্ম্মানুসারে আমরণ তাহা তাহার চিত্তে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া যায়। আদি যুগে আর্য্যগণ সর্ব্বদা দেবসান্নিধ্য ও দেবভাবাপন্ন ছিলেন। দেবতা ও মানবে ভেদ নামমাত্র পর্য্যবশিত হইয়াছিল, কিন্তু কালধর্ম্মে দেবতা ও মানব মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধান আনিয়াছে। তাঁহারা দেবতাকে যে চক্ষে দেখিতেন, তাঁহাদের দেবতার আদর্শ বর্ত্তমান দেবতার আদর্শ অপেক্ষা অনেক ভিন্ন ছিল। বর্ত্তমানে দেবতা বা ভগবানের নামে মানব-মনে যে ভাবের উদয় হয়, আমাদের বিশ্বাস পূর্ব্ব-যুগে যে ভাবের উদ্দীপনা হইত না; ইহার কারণ আলোচনা করিয়া আমরা এই বুঝিতে পারি যে, কালে কালে আমরা দেবচরিত্র ও দেব-আদর্শ হইতে এত পিছাইয়া পড়িয়াছি যে, দেবতার নামে আমাদের প্রীতি ও আনন্দের পরিবর্ত্তে ভীতি ও

কুণ্ঠার উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং সরলচিত্তা অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাগণকে দেবতা কথাটী সর্ব্বাগ্রেই বুঝাইতে হইবে। কারণ বর্ত্তমানে যে অর্থে ও যে আদর্শে দেবতা আখ্যাত স্বামী "দেবতা" স্বরূপ একথা বলিলে বালিকার মনে স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও ঐকান্তিক প্রীতির পরিবর্ত্তে অজানিত শঙ্কা ও অপরিসীম কুণ্ঠার উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

(দেবতা শব্দের অর্থ যিনি জীবনে মরণে একমাত্র সহায়; বিপদে সম্পদে একমাত্র অবলম্বন; পার্থিব সর্ব্বকার্য্যে একমাত্র শুভ; যিনি আশীর্ব্বাদ করিতে জানেন, অভিশাপ জানেন না; যিনি সর্ব্বসঙ্কোচ, সর্ব্বপাপ দূর করিয়া চিরপবিত্র করেন; যিনি আমাদের নিতান্ত আপনার। যিনি আমাদের কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না; যিনি আমাদের জ্ঞানমার্গের শিক্ষক, ভক্তিমার্গের প্রদর্শক ও ক্রীড়ামার্গের সঙ্গী; যিনি আমাদের অন্তর্বাহিরে থাকিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তিনি দেবতা। তাঁহার কাছে আমাদের গোপনের কিছু নাই; লজ্জার কিছু নাই; সঙ্কোচের কিছু নাই। আমরা বিপথে যাইলে তিনি বারণ করেন; বিপদে পড়িলে বুকে টানিয়া লন্; ডাকিলে বা না ডাকিলে তাঁহার পবিত্র বাহুর দ্বারা সর্ব্বদা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখেন। তিনি একাধারে আমাদের গুরু, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও ক্রীড়ার

সাথী; এমন আত্মীয়, এমন স্বজন, এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জগতে আর কেহ নাই; তিনি, দোষ করিলে রোষ করেন না; অপরাধ করিলে পায়ে ঠেলেন না; হিন্দু রমণীর স্বামী—এই দেবতা। এ দেবতা শুধু পূজা-পুষ্পাঞ্জলি লইবার জন্য সিংহাসনে বসিয়া থাকেন না; ত্রুটি অপরাধ ধরিয়া অভিশাপ দেন না; উপহার পাইয়া বর দেন না; এ দেবতা শুধু ধ্যানের দেবতা নহেন, আরাধনার দেবতা নহেন, সাধনার দেবতা নহেন; অভাবে-অভিযোগে শুভে-অশুভে, কর্ম্মে-অকর্ম্মে আমাদের নিত্য সঙ্গী—নিত্য সহায়।

পত্নীত্ব

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে হিন্দু রমণীর স্বামী-দেবতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে তাঁহার পূজার মন্ত্র ও সেবার বিধি—অর্থাৎ তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্যের বিষয় কিছু বলিব। এক্ষণে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ নির্ণয় প্রথম ও প্রধান আবশ্যক। এক-কথায় সংসারজীবনে—শুধু সংসারজীবনে কেন—ধর্ম্মজীবনে, ইহকালে ও পরকালে—সর্ব্বকালে—সকল অবস্থায় এবং সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরে যে অচ্ছেদ্য, অবেধ্য ও অবিনশ্বর চিরসম্বন্ধ

ইহাই স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ। তুল্য মূল্য রূপে উভয়ের আকর্ষণ এবং উভয়ের আবশ্যকতা অবস্থান করিতেছে। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি হইতে রাধা অন্তর্হিতা হইলে কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব থাকে না। আবার কৃষ্ণশূন্যা রাধার অস্তিত্বও নাই। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই অনির্ব্বচনীয় সূক্ষ্ম সম্বন্ধ। স্বামী যদি দেবতা হন, পত্নীও দেবী। তাহা হইলে পূজা পদ্ধতি শুধু সেব্য সেবিকা ভাব লইয়া নহে। ইহার মধ্যে আনন্দ ও প্রীতির বিকাশ থাকা চাই। মনে পূর্ণ বিশ্বাস থাকা চাই, তুমি যেমন স্বামীর নিষ্ঠাবতী সেবিকা, সেইরূপ তুল্যরূপে তাঁহার আনন্দ ও প্রীতির পাত্রী। ইহা কতকটা অধ্যাত্ম উচ্চভাবের কথা হইল। এক্ষণে নিত্যনৈমিত্তিক সংসার-জীবনের কার্য্যাবলী লইয়া আলোচনা করা যাউক। কুমারী অবস্থায় "সৎস্বামী" লাভের জন্য শিব-পূজার বিধি আছে। আমাদের মনে হয় উহা 'সৎস্বামী' লাভের জন্য নয় —সুপত্নীত্ব লাভের জন্যই উপাসনা। মা যেমন শৈলশিখরে একান্তমনে উপাসনায় সর্ব্বত্যাগী জটাবল্কলধারী সন্ন্যাসী বিভূতিভূষণ শ্মশানবাসী চিরবৃদ্ধ শিবকে স্বামীরূপে লাভ করিয়া সুপত্নীত্বের চরমাদর্শ দেখাইয়াছেন, সেইরূপ প্রত্যেক হিন্দু-কুমারীর স্বামী যেমন অবস্থাপন্ন হউন না স্বামীরূপে লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার তুষ্টি বিধান করিয়া চিরদিনের

জন্য তাঁহার সহিত মিলিত থাকা—কুমারীর শিবব্রতের চরম লক্ষ্য।

আমাদের হিন্দুধর্ম্মে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, চিরসম্বন্ধ। জন্মজন্মান্তরে একই স্বামী ভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট পত্নীকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দু বিবাহমন্ত্রের এমনই অনন্তশক্তি, তাহাতে স্বামী যেরূপই হউন না কেন, পত্নীর নিকট তিনি বরেণ্য হইবেনই। সুতরাং স্বামী ভাল হউন কিংবা মন্দ হউন, এ চিন্তা করিবার কুমারীর আবশ্যক নাই। শুভদৃষ্টির পবিত্র মুহূর্ত্ত হইতে স্বামীর প্রতি আকর্ষণ হিন্দুরমণীর ভগবদ্দত্ত দান।

বাসর-ঘর হইতে স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধের আরম্ভ। এখান হইতেই স্ত্রীজীবনে স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনের প্রথম সূত্রপাত। প্রচলিত প্রথা অনুসারে বাসর-ঘরে পরিহাস-কৌতুক চলিয়া আসিতেছে; তাই বলিয়া সে কৌতুকে পূর্ণ যোগদান নববিবাহিতা বালিকার কর্ত্তব্য নহে। অথচ যে কৌতুকে স্বামী আনন্দ লাভ করিতেছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীনা বা লক্ষ্যহীনা হইলেও চলিবে না। সম্পূর্ণরূপে প্রগল্‌ভতাবর্জ্জিতা হইয়া সে আনন্দ উপভোগ করা চাই। অনেক সময় এমন হয় প্রথম মিলনে, স্বামী, স্ত্রীর নিকট হইতে নানা কথা শুনিবার বাসনা করেন। কিন্তু স্ত্রী যদি

প্রগল্‌ভতা বা লজ্জাহীনার ন্যায় অসঙ্কোচে তাঁহার সর্ব্বকথার উত্তর দান করে; সেটাও কিন্তু স্বামীর নিকট প্রীতিপ্রদ হয় না। সুতরাং লজ্জা ও ধীরতার সহিত তাঁহার প্রশ্নের সংক্ষেপ উত্তর করাই যুক্তিযুক্ত।

পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে প্রথম আগমনে নববধূর সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করিয়াই প্রথমেই স্বামীর আরাধ্যদেবী শ্বশ্রূমাতার অথবা তিনি অবর্ত্তমানে সংসারের গৃহিণীর মনস্তুষ্টি সম্পাদন আবশ্যক। কারণ তাঁহাদের মুখে পত্নীর সুখ্যাতি শুনিলে স্বামীর সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। তৎকালে যে অল্পকাল স্বামিগৃহে বাস করিবে, তাহারই মধ্যে যত্ন আকর্ষণ দেখাইয়া স্বামীকে এরূপ বশীভূত করা চাই, যাহাতে তোমার প্রত্যাবর্ত্তনে তাঁহার মধ্যে একটা টান জাগিয়া উঠে। পিতৃগৃহ হইতে আবশ্যক মত তাঁহাকে পত্রাদি দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং তাহাতে যেন তাঁহার স্বাস্থ্য ও সাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধেই কথা থাকে; নিজের কথা খুব কমই থাকে।

নূতন বিবাহের পর উপহারাদি প্রদান বর্ত্তমানে একটী প্রথার মধ্যে গণ্য হইয়াছে। স্বামীর অবস্থা সচ্ছল বা অসচ্ছল হউক নিজের জন্য কোনদিন কোন জিনিস মুখ ফুটিয়া

চাহিতে নাই। তিনি আনন্দ করিয়া যাহা দিবেন, আহ্লাদের সহিত তাহা গ্রহণ করিবে। সকলেরই স্বামী যে সম্পন্ন হইবেন তাহা আশা করা যায় না। যদি অদৃষ্টক্রমে স্বামী দরিদ্র হন্, সন্তুষ্ট থাকিয়া তাঁহার সে দরিদ্রতার অংশ গ্রহণ করাই পত্নীর প্রধান কর্ত্তব্য। ধনীর পত্নীও যেন বিলাসিতায় মগ্ন না হন। স্বামী বিদ্বান্, চরিত্রবান্ ও ন্যায়নিষ্ঠ হইলে পত্নীর আনন্দের কথা সন্দেহ নাই, চরিত্রহীন ও 'বদ্‌রাগী' হওয়াও অসম্ভব নহে, এ ক্ষেত্রে পত্নীর একমাত্র অবলম্বন—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। তাঁহার কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করা নববধূর কর্ত্তব্য নহে। যত্ন, আদর, সেবা ও শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার মনকে এমন বশীভূত করিতে হইবে, যেন তাহাকে ছাড়িয়া তাঁহার মন বিষয়ান্তরে উৎক্ষিপ্ত হইবার অবসর না পায়। দুই একদিনে সুফললাভ না হইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ সাধনায় সফলতা লাভ অবশ্যম্ভাবী। স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা কোন দিন জিজ্ঞাসা করিবে না। শুনিবার আকাঙ্ক্ষাও যেন কোন দিন মনে না হয়। কেহ যদি পরিচয় করিতে আসে তাহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। স্বামী যে কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইসে কোনক্রমে তাঁহার সহিত তর্ক করিবে না। নীরবে তাঁহার ইঙ্গিত কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিবে। পরে রাগ পড়িলে মিষ্ট

কথায় তাহার যদি কোন ভ্রম হইয়া থাকে বুঝাইয়া দিবে।

কোন্ কোন্ বস্তু স্বামীর প্রিয়, কোন্ কোন্ খাদ্য স্বামীর বাঞ্ছিত, দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে কৌশলে জানিয়া লইবে। এবং যে কোন কার্য্য আদেশের পূর্ব্বেই তাঁহার অভিপ্রায় মত সম্পন্ন করিবে, তাহাতে স্বামীর পরমানন্দ। দৈনিক কার্য্যশেষে শ্রান্তদেহে স্বামী গৃহে আসিলে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রান্তি দূর করার ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে যদি সংসারের কেহ অসন্তুষ্ট হন বা কিছু বলেন, নীরবে সহ্য করিবে। যতক্ষণ তিনি সুস্থতা অনুভব না করেন, ততক্ষণ কার্য্যান্তরে গমন করিবে না। গৃহ হইতে যখন স্বামী বহির্গত হইবেন, গমনকালে যথাসাধ্য তাঁহার সম্মুখিন হইবার চেষ্টা করিবে এবং কোন আবশ্যক দ্রব্য লইতে ভুলিয়া গেলেন কিনা তাহা লক্ষ্য রাখিবে।

কদাচ স্বামীর কোন অন্যায় কার্য্যের বিষয় সঙ্গিনী বা অপর কাহারও সহিত পরিচয় করিবে না। যদি কেহ তোমার সাক্ষাতে স্বামীর নিন্দা করে, স্বামী প্রকৃত দোষী হইলেও প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিতা হইও না। নিন্দাকারী যদি গুরুজন হন্, সেখান হইতে সরিয়া যাইবে। সাংসারিক কার্য্যের চিন্তা হইতে স্বামীকে যতদূর সম্ভব অব্যাহতি দিবার

চেষ্টা করিবে। ক্লান্ত অবস্থায় অথবা বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় কদাচ কোন দুঃসংবাদ বা অপ্রিয় কথা তাঁহাকে শুনাইবে না। স্বামীর দৈনন্দিন কার্য্যগুলি চাকর-চাকরাণী বা অন্য কাহারও উপর ভার না দিয়া যতদূর সম্ভব নিজহাতে সম্পন্ন করিবে। নিজের দৈহিক অসুস্থতার কথা তাঁহার সহিত যত কম পরিচয় করা যায় ততই ভাল। স্বামীর আহারের পূর্ব্বে * সম্ভব হইলে কদাচ আহার করিবে না, বা নিজের আহারের বিষয় কখনও পরিচয় করিবে না এবং যতদূর সম্ভব গোপনে তাহা সম্পন্ন করিবে। স্বামী যতক্ষণ নিদ্রিত না হন্, শরীর সুস্থ থাকিলে ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে না, তাঁহার সেবাকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিবে। প্রত্যহ প্রভাতে শয্যাত্যাগের সহিত তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবে। এবং তাঁহার প্রাতঃকৃত্যের সমুদয় আয়োজন সম্পন্ন করিবে। কোনরূপ আমোদ উৎসবে স্বামিসেবা ত্যাগ করিয়া যোগদান করিবে না; বিশেষ আবশ্যক হইলে তাঁহার অনুমতি লইবে, এবং যত সত্বর পার প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করিবে। সন্তানাদি হইলে তাহাদের

* হিন্দুশাস্ত্রে বলে—দেবতাদের বা ভগবানের জন্য যাহারা রন্ধন করেন তাঁহারা জীব হত্যার পাপ গ্রহণ করেন না। নিজের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিলে তাহা বিষ্ঠাতুল্য হয় এবং যতগুলি অন্ন সিদ্ধ হইয়াছে ততগুলি জীব-হত্যার পাপ গ্রহণ করিতে হয়। সেই জন্য আমাদের সর্ব্বকার্য্য দেবতা ভগবানের বা অতিথির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিৎ। আমরা যজ্ঞের অবশিষ্টাংশ দেব-প্রসাদ-রূপে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিবার অধিকারী।

লালনপালনের মধ্যে স্বামিসেবাটুকু না ডুবিয়া যায়। স্বামীর সর্ব্ব কার্য্যে পূর্ণমাত্রায় সহানুভূতি ও আনন্দ প্রকাশ করা সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামীর আদেশ সত্ত্বেও কদাচ লজ্জাহীনতার কোন কার্য্য করিবে না। এক কথায় স্বামীর চরিত্র, মনোভাব ও প্রকৃতির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে পারিলেই জগতে অমর পত্নীত্ব লাভ করা যায়।

শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্য

কুমারীজীবনের পর স্বামীগৃহে আগমন—স্ত্রীজীবনে একটী সম্পূর্ণ নূতন অঙ্ক। বহু যুগ-যুগান্তর হইতে এ অভিনয় ভূয়ঃ-দৃষ্ট হেতু বর্ত্তমানে অনেকটা সহজ সরল হইয়া আসিলেও চিন্তা করিয়া দেখিলে এ একটী বড় গুরুতর সমস্যা। সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা, সরলচিত্তা বালিকার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত এবং বহু বিষয়ে পিত্রালয় হইতে ভিন্নরুচি ও প্রথাযুক্ত পরিবারের মধ্যে আসিয়া, অত্যল্প দিন মধ্যে পরমাত্মীয় পরিজনে পরিণত হওয়া যে কত কঠিন, কত অদ্ভুত, তাহা চিন্তা করিলেও চক্ষে জল আসে। উক্ত বিষয়ে হিন্দু জাতির মধ্যে এমন সহজ সমাবেশ দেখিয়া এ জাতির উপর শ্রীভগ-

বানের যে অনন্ত করুণা তাহা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। জানিনা প্রজাপতির কোন শুভ আশীর্ব্বাদে এ পুণ্য বন্ধন এত দৃঢ় হয়, যেখানে অন্যদেশে বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীর 'পূর্ব্বপরিচয়' সত্ত্বেও মিলনভঙ্গের আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। অবশ্য আমরা একথা বলিতেছি না যে এদেশে স্ত্রীমাত্রেই স্বয়ং-সিদ্ধা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সংসারজীবনে অশেষবিধ গুণ তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ হইলেও সে বিষয়ে যথাসম্ভব উপদেশ দেওয়া ও পন্থা নির্দ্দেশ করাও বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। একারণে এ প্রবন্ধে আমরা নারীজাতির পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর ও শাশুড়ীর প্রতি কর্ত্তব্যের বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

বধূ প্রথম শ্বশুর-গৃহে আসিবার পূর্ব্বে প্রায়ই শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহাকে দেখিবার সুযোগ পান না। সুতরাং রূপে ও লাবণ্যে তাঁহার মনঃপূত হওয়া নববধূর পরমভাগ্য। আজও পাড়াগাঁয় এমন দেখা যায়, বধূ কুরূপা হইলে শাশুড়ী মঙ্গলবরণ ও হুলুধ্বনি ত্যাগ করিয়া ক্রন্দন করিতেও কুণ্ঠিতা হন না। অথচ তার জন্যে নববধূর কোন অপরাধই নাই। কারণ দেহ যে তার ভগবদ্দত্ত, আত্মকৃত নহে। যাহা হউক সেক্ষেত্রে বালিকার বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে

হইবে। শাশুড়ীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই এমন ধীরতা ও করুণ ভাবে তাঁহার পদধূলি লইতে হইবে ও এমন ভঙ্গীতে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে হইবে এবং সুযোগ হইলে এমন কাতরতার সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে হইবে, যেন তাঁহার স্ত্রীসুলভ করুণহৃদয় গলিয়া যায়। যে কয়দিন বিবাহ উপলক্ষে শ্বশুর-গৃহে বাস করিতে হইবে, সে কয়দিন যতদূর সম্ভব শাশুড়ীর কাছে কাছে থাকিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। যদিও বা মনের ক্ষোভে তিনি কিছু কটুকথা কহিয়া ফেলেন, না কাঁদিয়া অথচ বিশেষ কাতরা হইয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী থাকিবে। কদাচ অন্যত্র চলিয়া যাইবে না। এই অল্পকাল মধ্যে যতদূর সম্ভব তাঁহার মেজাজের বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিবে এবং সেই মত চলিতে যত্নবতী হইবে। ভবিষ্যতে তাঁহার প্রিয় কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান করিয়া ও অপ্রিয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে পার, সে বিষয়ের সূত্রপাত প্রথমযাত্রায় করিয়া আসিবে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ "আত্মীস"কে বড় ভালবাসেন, সুতরাং সর্ব্বকার্য্যে ও সর্ব্বক্ষণ সেই আত্মীসয়তা যতদূর দেখাইতে পার তাহার প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। এ-সময়ে বধূর সর্ব্বদাই মেয়েদের মধ্যে থাকিতে হয়, সুতরাং শ্বশুরের সহিত সাক্ষাতের বিশেষ অবসর হয় না। সাক্ষাৎ

হইলে কন্যার ন্যায় অথচ লজ্জার সহিত তাঁহার সহিত আলাপাদি করিবে।

পিত্রালয়ে আসিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীকে ভক্তি ও সম্মানের সহিত গৃহের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র দিতে বিস্মৃত হইও না। তাঁহাদের কোন অপ্রিয় আচরণের কথা পিত্রালয়ে আসিয়া, এমন কি পিতা-মাতার সহিতও প্রকাশ করিবে না।

প্রথম ঘর সংসার করিতে গিয়া বহুপরিচিতা কন্যার ন্যায় শ্বশুর ও শাশুড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। এবং সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া যতদূর সম্ভব আমোদ-আহ্লাদের সহিত তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে। শাশুড়ীর হাতের কাজ তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও হাসিমুখে সর্ব্বদা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। এবং তাঁহার দৈহিক সচ্ছন্দের বিষয় লক্ষ্য রাখিবে। যথাসময়ে জলখাবার গুছাইয়া দেওয়া, বিছানা পাতিয়া দেওয়া, কাপড়খানি কাচিয়া দেওয়া, এবং শুকাইয়া তাহা যথাস্থানে রাখা, তাঁহার পূজাদির আয়োজন করিয়া দেওয়া, এবং অবসর মত কাছে বসিয়া তাঁহার হাত পা টিপিয়া দেওয়া ও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনান—নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য যত্নের সহিত সম্পন্ন করিবে। যাহাতে তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া সেই কার্য্য করিতে পার, সেজন্য বিধিমত চেষ্টা করিবে। এই-

রূপ শ্বশুর মহাশয়েরও আবশ্যক কার্য্যাদি যথানিয়মে পালন করিবে।

আমাদের সমাজে আজও "বউকাঁটকি" অপবাদ শাশুড়ীদিগের মধ্যে দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অস্বাভাবিক অনুরক্তি ও বধূর শাশুড়ীর প্রতি আংশিক উপেক্ষা তাহার একমাত্র কারণ। আজকাল দেখা যায়, অনেকস্থলে মাতাপিতা জীবিত থাকিতেও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইয়া অর্জ্জিত অর্থ স্ত্রীর নিকট রাখিতে কুণ্ঠিত হন্ না, এবং স্ত্রীও সেটাকে নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন, এবং একটু "দেমাকের" সহিত তাহা ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষিতা বা উন্নতচরিত্রা না হইলে পুত্র ও পুত্রবধূর এ আচরণ সহ্য করা সহজ নহে। সুতরাং স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ তোমার নিকট রাখিতে আসিলেও, তিনি যাহাতে উহা তাঁহাদের কাছে রাখেন, তাহার প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। তবে যদি তাঁহারা স্বেচ্ছায় তোমার নিকট রাখিবার অনুমতি করেন, তুমি রাখিবে। কিন্তু কদাচ উহা নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া মনে করিও না। দ্বিতীয়তঃ নিজের জন্য কোন দ্রব্য ক্রয়কালে তাঁহাদিগের অগোচরে বা অনুমতি না লইয়া ক্রয় করিবে না। যতদিন তাঁহারা জীবিত থাকেন, তাঁহাদিগের অভাব সর্ব্বাগ্রে পূর্ণ করিয়া তবে নিজের অভাব দূর করিবে।

বৃদ্ধবয়সে স্বভাবতঃ লোকে লোভপরবশ হইয়া পড়েন ; সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদের রুচিকর খাদ্যের আয়োজনে যত্নবতী হইবে। সংসারের অন্যান্য পরিজনের "খুঁটীনাটী" দোষত্রুটীর কথা কদাচ তাঁহাদের কাণে তুলিও না। যতদূর সম্ভব তাঁহাদের শয়নের পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া শয়ন করিও না। মানুষ মাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন, তাঁহাদের স্বভাবে যদি কোন অস্বাভাবিক ভাব থাকে, সে বিষয়ে কখন প্রতিবাদ করিবে না। বধূরূপে সর্ব্বদা কন্যার ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করিবে। এবং তুমি যে তাঁহাদের একান্ত আশ্রিতা এবং তোমার স্বাতন্ত্র্য কিছু নাই এভাব যেন তোমা হইতে লুপ্ত না হয়। তোমার যেমন কন্যার স্নেহ তাঁহাদের নিকট প্রার্থনীয়, তাঁহাদের প্রতি তোমার ভক্তি, তদনুরূপ হওয়া উচিত। তাঁহারা শুধু তোমার পূজার পাত্র নহেন, তোমার পরমপূজ্য স্বামীর পরম পূজনীয়। এই জ্ঞানে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবে।

ভাসুর ও পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে সম্বন্ধের একটা "ডাল-খিচুড়ী" হইয়া গিয়াছে। কবে এবং কিরূপে নিম্নোক্ত কুপ্রথাগুলি

আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সে বিষয়ের আলোচনা করিব না। বর্ত্তমান প্রথার দোষগুণের বিষয় দুই একটী কথা বলিব মাত্র।

ভাসুর এক্ষণে পূজ্যপাদ পিতার স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অস্পৃশ্য অনাত্মীয়রূপে পরিণত হইয়াছেন। যিনি ভ্রাতৃ-বধূকে মাতৃসম্বোধন করেন, তাঁহার ছায়াস্পর্শ এখন কলঙ্ক ও পাপের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জানি না কোন্ যুক্তি ও ভিত্তির উপর এ প্রথা স্থাপিত। তাঁহার সম্মানরক্ষার্থে যদি বাক্যরোধ বিধি হয়, তবে কোন্ ব্যবস্থায় তাঁহার পূজ্য পিতৃদেবের সহিত বাক্যালাপ চলিতে পারে? বর্ত্তমানে এ প্রথা ভ্রাতৃবধূকে ভাসুরের কন্যা-স্নেহ হইতে দূরে রাখে বলিয়া আমাদের মনে হয়। পুরাণ ও পুরাবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে বর্ত্তমান প্রথার কোন সূত্রই দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের মনে হয় কন্যোচিত সভক্তি ব্যবহারই ভাসুরের প্রতি ভ্রাতৃবধূর প্রশস্ত। কি পাপে রোগযন্ত্রণায় অস্থির ভাসুরের মুখে বারিদানে ভ্রাতৃবধূ বঞ্চিতা হইলেন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না।

তবে একটী গুরুতর কথা এই, উভয়ে পিতৃতুল্য হইলেও শ্বশুর ও ভাসুরে একটু প্রভেদ আছে। শ্বশুর বয়ঃপ্রাপ্ত, সন্তানবৎসল ও ক্ষমাশীল; পুত্রবধূর যেকোন অপরাধ, যেকোন

ত্রুটী তিনি সহজেই ক্ষমা করিতে পারেন, এবং পুত্রবাৎসল্যে পুত্রপত্নীর কোন অন্যায় ব্যবহার তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু ভাসুর পিতৃতুল্য হইলেও কনিষ্ঠের উপর সর্ব্বদা অগ্রজত্বের দাবী রাখেন। অনুজ তাঁহার প্রতিপাল্য হইলেও তাঁহার পালনে তাঁহার একটু শ্লাঘা আছে, সুতরাং কনিষ্ঠের ত্রুটী তাঁহাকে একটু অভিমান জাগাইয়া দিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সুতরাং এক্ষেত্রে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যদি কোন কারণে তাঁহার অপ্রিয়া হন বা মনোব্যথা দেন, তাঁহার আর ক্ষোভের স্থান থাকে না। যিনি কনিষ্ঠকে প্রাণতুল্য ভালবাসিয়া লালন-পালন করিয়াছেন, যিনি বড় আদরে মাতৃসম্বোধনে ভ্রাতৃবধূকে ঘরে আনিয়াছেন; আজ যদি সেই ভ্রাতৃবধূ তাঁহার অসম্মাননা করে, তবে তাঁহার দুঃখের সীমা থাকে না। এই মনঃপীড়ার ভয়ে ভীত হইয়াই হিন্দুসমাজ বোধ হয় ভ্রাতৃবধূকে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা হউক এ প্রথা প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ভ্রাতৃবধূকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া যাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র মনঃকষ্টের কারণ না হয় এরূপভাবে চলিতে হইবে। ভাইয়ে ভাইয়ে যদি কখন কথান্তর বা মনান্তর হয় সে সম্বন্ধে কোন কথাই কহিবে না। সাংসারিক কার্য্যে বিরক্ত হইয়া যদি তিনি কোন রূঢ় কথা বলেন—অম্লানবদনে সহ্য করিবে, কোন প্রতিবাদ

করিবে না। তাঁহার পরম যত্নের, পরম স্নেহের কনিষ্ঠ তোমার সংশ্রবে পর হইয়া যাইতেছেন এ কলঙ্ক কোনদিন তোমায় যেন স্পর্শ করিতে না পারে। আদর বা আবদার লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত না হইলেও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও সেবা করিতে যত্নবতী হইবে।

বর্ত্তমানে দেবরের সহিত যেরূপ ব্যবহার ও আচরণ চলিতেছে, তাহাও বিধিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যে জাতির আদর্শ সীতা ও লক্ষ্মণ, সে জাতির ভিতর প্রচলিত প্রথা কিরূপে সম্ভবে? দেবর সন্তানস্থানীয়—সর্ব্ববিধ সন্তান-স্নেহ তাহার প্রাপ্য, তাহার সহিত রহস্যালাপ কোন-রূপে যুক্তিযুক্ত ও ভদ্রতাসিদ্ধ হইতেই পারে না। দেবর বয়োজ্যেষ্ঠ হইলে আমাদের মতে যতদিন পর্য্যন্ত বধূ উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা না হন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত স্বাধীন আলাপ না করাই ভাল। করিতে হইলেও তাহা বিশেষ সাবধানতা ও শিষ্টাচারের সহিত হওয়াই উচিত। তাই বলিয়া তাহার দূরবর্ত্তিনী থাকাও কর্ত্তব্য নহে, সর্ব্বদা সন্তানবোধে যত্ন ও স্নেহ করা কর্ত্তব্য। দেবর শিশু হইলে জেষ্ঠ্যা ভগিনীর ন্যায় তাহাকে সর্ব্বদা লালনপালন করিবে।

ননদিনীকুল সাধারণতঃ একটু অভিমানিনী হইয়া থাকেন, সুতরাং ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য হইলেও তাঁহাদিগকে

একটু সম্মান করাও উচিত। এ ভাব যেন কখনও দেখাইও না যে তাঁহাদের ভ্রাতা তোমার একান্ত অনুগত হইয়াছেন। অন্যবিধ রহস্যালাপ তাঁহাদিগের সহিত করিলেও স্বামী সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহাদের সম্মুখে বলা উচিত নহে। তাঁহাদের বেশবিন্যাস বিষয়ে সর্ব্বদা সহায়তা করিও, এবং সখীভাবে আনন্দে রতা থাকিবে। কোন গুরুজনের দোষত্রুটী সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিবে না। শাশুড়ী অবর্ত্তমানে শ্বশুরালয় হইতে তাঁহাদিগকে পিতৃগৃহে আনিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিবে, এবং স্বগৃহে আনিয়া মাতৃস্নেহে স্বর্গগতা জননীর দুঃখ ভুলাইয়া দিবে। ক্রিয়া-কর্ম্ম পর্ব্বাদি উপলক্ষে তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব "তত্ত্বতাবাসাদি" করিবার জন্য স্বামীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিবে। মাতৃবিয়োগের সহিত তাঁহাদের পিত্রালয়ের সম্বন্ধ যেন না ঘুচিয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশে যদি কোন ননদিনী বিধবা হইয়া তোমার স্বামীর প্রতিপাল্যা হন, সর্ব্বদা প্রাণপণ যত্নে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিবে, এবং সাংসারিক সমুদয় কার্য্যে তাঁহাকে অভিভাবিকা ও গৃহিণীর স্থান দিবে। এবং তাঁহার পুত্র-কন্যাগণকে স্বীয় পুত্র-কন্যানির্ব্বিশেষে স্নেহ ও পালন করিবে। সন্তানহীনা হইলে, নিজের একটী শিশু সন্তানকে তাঁহার অনুগত করিয়া দিয়া তাঁহার সন্তানের অভাব ও মনঃক্ষোভ

দূর করিবে। সংসারখরচের অর্থাদি তাঁহার হাতে থাকাই ভাল, তাহাতে তাঁহার মনে অনেকটা শান্তি থাকিতে পারে।

সংসারের দাস-দাসীদিগের সহিত অবস্থাভেদে পুত্র-কন্যা বা ভ্রাতা-ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিবে। তাহারা যে তোমার "হুকুমের চাকর" এভাবটী তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিও না। পরিবারস্থ পরিজনের ন্যায় গণ্য করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে সদ্‌ব্যবহারে দাস-দাসী পরমাত্মীয় পরিজনে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের দৈহিক ও মানসিক সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আহারকালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিবে। সাধারণ ভোজ্য পানীয় তোমাদের হইতে স্বতন্ত্র না হয়, কারণ তা'রাও মানুষ, তা'রাও তোমার সন্তান। বিপদে সম্পদে তাহাদিগকে গৃহগমন হইতে বিরত করিবে না। নিজের কষ্ট হইলেও সংসার-জীবনের সে সুখ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিও না। উৎসবাদিতে যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে নব-বস্ত্রাদি দিবার চেষ্টা করিবে। তাহাদের কোন আত্মীয় স্বজন দেখা করিতে আসিলে তাহাদের সম্মান করিয়া ইহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিবে। পারতপক্ষে যথানিয়মে ইহাদের বেতনাদি দিয়া অভাব দূর করিবে। সামান্য দোষ-

ক্রুটীতে বিতাড়িত করিবার বাসনা তোমার মনে যেন না জাগে।

সর্ব্বোপরি পারিবারিক জীবনে একটী বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে পদে পদে বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা। বর্ত্তমানকালে পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, মন্থরার অভাব নাই। ইহারা নানা ছলে সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হইয়া তোমার প্রিয়কারিণীরূপে দেখা দিবে। হঠাৎ ইহাদিগকে চিনিতে পারিবে না। তবে এইটুকু যেন তোমার সর্ব্বদা মনে থাকে যে শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, স্বামী, দেবর ইত্যাদি যত অপ্রিয়কারীই হউন তাঁহাদের মত আপনার জগতে তোমার আর কেহ নাই। তাঁহাদের ন্যায় আপনার কেহ আর থাকিতে পারে না। থাকিলেও তাঁহাদের ছাড়িয়া জগতে তোমার যে আর কোন সুখ নাই। সুতরাং ইহা-দিগের বিরুদ্ধাচারিণী কোন প্রিয়বাদিনীর মিষ্ট কথায় কখন কর্ণপাত করিবে না। একবার প্রশ্রয় দিলে তোমাকে এমন মোহিত করিয়া ফেলিবে যে তোমার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকিবে না। সংসারের শান্তিস্থাপন উহাদের উদ্দেশ্য নহে, সংসারের শান্তিনাশই উহাদের জীবনের ব্রত। ঘরের কোন কথা উহাদের নিকট প্রকাশ করিবে না। ঘূণাক্ষরে কোন কথা জানিতে পারিলে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। তোমার

যম ও সাবিত্রী

সুখ হোক্, দুঃখ হোক্, আত্মীয়ের হাতেই হউক ; অনাত্মীয় হিতাকাঙ্ক্ষিণীর নিকট কোন সুখের আশা করিও না। আমাদের সমাজে যত সংসার ভাঙ্গে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাহার মূলে একটী না একটী মন্থরা আছেই আছে। এবং যাহারা তাহার মন্ত্রণায় ভুলিয়াছে, তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ইহাদিগকে যত্নও করিবে না, অযত্নও করিবে না। ইহারা প্রশ্রয় না পাইলেই আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবে।

সন্তান পালন

নারীজীবনের প্রধান কর্ত্তব্যগুলির মধ্যে সন্তানপালন অন্যতম ; সুসন্তানপ্রসবিনীই নারীসমাজে বরণীয়া। বর্ত্তমান সমাজের দোষেই হউক বা শিক্ষাবিপর্য্যয়েই হউক এবিষয়ে রমণীগণ লক্ষ্যহীনা হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের মতে "কাঞ্চন ফেলিয়া আঁচলে গেরো" দেওয়ার ন্যায়, প্রধান কর্ত্তব্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অকিঞ্চিৎকর শিক্ষায় মনোনিবেশ প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং স্বাধীনভাবে এবিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না।

সন্তানপালন সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিতে গেলে প্রসূতির গর্ভসঞ্চার হইতে সন্তানের প্রাপ্তবয়স কাল পর্য্যন্ত আলোচনা করাই কর্ত্তব্য।

প্রসূতি গর্ভসঞ্চারকাল হইতে সর্ব্বদা শুচিভাবে ও আনন্দিত মনে কালযাপন করিবেন। কারণ গর্ভাবস্থায় জননীর মানসিক অবস্থা ও বৃত্তি প্রায়শঃ সন্তানে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ের উদাহরণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পুরাণাদিতে ভূয়সি প্রদত্ত হইয়াছে। গর্ভস্থিতাবস্থায় বীরবালক অভিমন্যু, শৌর্য্যশীল পিতার ব্যূহভেদবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, একথা বোধহয় কেহই অবিশ্বাস করিবেন না। সুতরাং পরিজনবর্গের বিশেষতঃ প্রসূতির গর্ভকালে দৈহিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিরাখা আবশ্যক। স্বামীর কর্ত্তব্য সহধর্ম্মিণী যাহাতে সদা প্রফুল্ল থাকেন, সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য কদাচ কাহারও অপ্রিভাজন না হন। নিরর্থক কোন্দল, অনর্থক ক্রন্দন, অযথা ক্ষেদ, অসংযত ব্যবহার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। প্রসূতি প্রথম গর্ভবতী হইলে স্বতঃই পরিজন-বর্গের আনন্দবর্দ্ধিনী হন, তাই বলিয়া এসুযোগে তাঁহারা যেন কদাচ আলস্যপরায়ণা না হন। শ্রমরতা রমণীরাই সুখ-প্রসবের অধিকারিণী হইয়া থাকেন। সর্ব্বদাই এমত বিষয়ের আলোচনা ও শ্রবণ মনন করিবেন, যাহাতে মানসিক সদ্‌বৃত্তি-

গুলি সহজে ফুটিয়া উঠে ও গর্ভস্থ সন্তান তাহার সুফলভাগী হয়।

বর্ত্তমান হিন্দুশাস্ত্র মূলমন্ত্র হারাইয়া নারীজাতির করে "শুচিবাই" এ পরিণত হইয়াছে। তাই আজ আঁতুড়ঘরের এত শোচনীয় অবস্থা। সাধারণতঃ বাটীস্থ নিকৃষ্ট ঘরটী আঁতুড়ের উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সদ্যোজাত শিশু জীবনের প্রথম প্রভাতে দেখে—একটী অন্ধকূপ, শ্বাস গ্রহণ করে—পূতিগন্ধময় রুদ্ধ বায়ু, তাহার পরিচ্ছদ—ছিন্ন চীর, শয্যা—জীর্ণ কন্থা। কোমল শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহার প্রত্যেকটী যে কত বিষময়, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। আর যে শিশুর জন্মে আমরা বংশ-গৌরবের কামনা করিয়া থাকি, আমরা এমনি নিষ্ঠুর যে তাহার প্রতি এই হেয় ব্যবহার পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিতেছি। যে স্থানে, যে পরিচ্ছদে, যে শয্যায়, একটী সবলদেহ সুস্থকায় যুবক পীড়িত হইয়া পড়ে, আমরা অন্ধ হইয়া এই কোমলকায় নবনিত কুমারকে রাখিবার ব্যবস্থা করি। আমাদের মনে হয় বঙ্গদেশে শিশুমৃত্যুর ইহাই প্রধান কারণ। ভ্রূণহত্যায় যদি পাপ থাকে, এবংবিধ শিশু-হত্যায় কি পাপস্পর্শ করিবে না? তাহার পর প্রসূতি যে এক-রূপ সদ্যোমৃত্যু-মুখ হইতে ফিরিয়া আসিল,—যাহার জীবনী

শক্তি ব্যতীত জীবিতের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না—তাহার প্রতি ব্যবহারও পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। অথচ তিনিই হয়ত সেই সংসারের সর্ব্বময়ী ও বংশরক্ষার নিদানভূতা। উক্ত বিষয়ের উন্নতি সাধন প্রসূতি অপেক্ষা পরিজনবর্গের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। নবজাত শিশুকে যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত স্থানে কোমল শয্যায় উষ্ণ পরিচ্ছদে আবৃত রাখাই কর্ত্তব্য। প্রসূতির পক্ষেও উক্তরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। প্রসবান্তে তিনি যেন সর্ব্বস্বাচ্ছন্দ্যে আবশ্যকানুযায়ী বিশ্রাম লাভে সমর্থা হন।

ধাত্রীহস্তে সন্তান সমর্পণ শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কেবলমাত্র প্রসূতির শ্রমলাঘব ও বিলাসবাসনার পুষ্টি সাধন জন্য এ ব্যবস্থা যে কতদূর দূষণীয় তাহা মনস্তত্ত্ববিৎ মাত্রেই অবগত আছেন। অর্থের সচ্ছলতা থাকিলে, সন্তানের জন্য ধাত্রী নিয়োগ না করিয়া, প্রসূতির জন্য করাই কর্ত্তব্য। হৃদয়ের ধনকে বক্ষরক্ত পান না করাইলে কি তাহার পুষ্টিসাধন হয়? পবিত্রকুলে মেধাবীর ঔরসে, পুণ্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া, হীনবংশীয়া কলুষিতচরিত্রা ধাত্রীস্তন্য কি ব্যবস্থা করা উচিত? খাদ্য ও সংসর্গ যে অনুরূপ ভাব সংক্রামিত করে এ বিষয়ে বোধহয় কাহারও সংশয় নাই। তবে কোনপ্রাণে

আমরা দৈহিক সুখের জন্য সংসার ও সমাজের ভাবী মঙ্গল এই স্বর্গপুত্তলিকার প্রতি ও ব্যবস্থা করিতে পারি? শিশুর প্রথম চক্ষু উন্মীলনের সহিত মনোমধ্যে জ্ঞানের আভা জাগিয়া উঠে, জননীর সস্নেহ আঁখির করুণ কটাক্ষে যে কোমল ভাবের স্বতঃ উদয় হয়, সম্পর্কহীনা ধাত্রীর যত্নে তাহা কি কখন ফুটিতে পারে? আমাদের বোধহয় সন্তান যত জননীর সংসর্গ লাভ করিতে পারে ততই তাহার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হয়।

সন্তানের অঙ্গে অলঙ্কার পরাইতে পারিলে অনেক জনক-জননী সুখী হইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের আনন্দ হইতে পারে বটে, কিন্তু শিশুর পক্ষে তাহা যথার্থই ক্লেশকর। পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধেও আবশ্যকাতিরিক্ত সাজ-সজ্জা বর্জ্জনীয়। যাহাতে শিশু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে এরূপ বেশেরই ব্যবস্থা করা উচিত। স্নেহাধিক্য বশতঃ অনেক প্রসূতি সর্ব্বদা সন্তানকে ক্রোড়ে রাখিয়া থাকেন, ইহা শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। পক্ষান্তরে অভ্যাসদোষে শিশু ভূমিস্পর্শ করিতে চাহে না, তাহাতে প্রসূতির অসুখ ও অসুবিধার কারণ হইয়া থাকে। শৈশবকাল হইতে সন্তানকে অত 'আতুপুতু' করা ভাল নয়। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর আবহাওয়া সহ্য করাইবার অভ্যাস করাইয়া সন্তানের দেহ গঠিত করা উচিত। সর্ব্বদাই বেশভূষায় শিশুর দেহ আবৃত রাখিতে নাই, তাহাতে দৈহিক

পুষ্টতা লাভের ব্যাঘাত ঘটে। বাল্যকাল হইতে সামান্য ব্যাধিতে যতদূর সম্ভব উষ্ণবীর্য্য ঔষধ সেবন না করানই ভাল। খাদ্য সম্বন্ধেও প্রাচুর্য্য না ঘটে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সামান্য আঘাতাদিতে অনেক জনক-জননী একান্ত অস্থির হইয়া উঠেন এবং সন্তানের সমক্ষে এরূপ ব্যাকুলতা দেখান, যে সন্তান বেদনা ভুলিয়া ভীত হইয়া পড়ে। এরূপ করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে সন্তানের সহ্যশক্তির আদৌ বিকাশ হয় না। পরন্তু কোনরূপ সহানুভূতি না দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকাই ভাল। তাহাতে বালকের সহ্যগুণ ও সাবধানতার বৃত্তি পাইবে। শিশুকে যেমন ননীর পুতুল করিয়া ক্রোড়ে ক্রোড়ে রাখা অযৌক্তিক, সেইরূপ গৃহপ্রাঙ্গণে স্বচ্ছন্দক্রীড়াশীল শিশুর দৈহিক পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনসাধনও একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে শিশুর অঙ্গ উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। শিশু ক্রীড়াশীল থাকিলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহার করান চাই। এবং শৌচ-প্রস্রাবাদি নিত্য নৈমিত্তিক দেহ-ধর্ম্মের প্রতি প্রত্যহ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

সন্তানের শিক্ষা

শিক্ষাশব্দটী বর্ত্তমানে প্রচলিত বিদ্যালয়াদিতে অধীত পুস্তকসমূহে যথাযোগ্য পরীক্ষোপযোগী জ্ঞানলাভে পর্য্যবসিত হইতে বসিয়াছে। এবং উক্ত শিক্ষাকে উপযুক্ত অর্থকরী করাই জনক-জননী বা অধ্যাপকগণের চরম লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বালক নিজশ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের প্রশ্নোত্তরে সমধিক সমর্থ, সে যদি অশেষবিধ কু-অভ্যাসের দাসও হয়, তাহা হইলেও সে স্বচ্ছন্দে জনক-জননীর স্নেহ লাভ করিতে পারে। অধীত পুস্তকে মেধাবিহীন চরিত্রবান্ বালকও সেপ্রকার স্নেহের দাবী করিতে পারে না। বর্ত্তমান পদ্ধতি যাহাই হউক, ইহা যে পূর্ণশিক্ষার অনুপযোগী ইহা অস্বীকার করা যায় না। মনুষ্য-হৃদয়ের সমুদয় সুপ্রবৃত্তিগুলির উন্মেষণ, পরিবর্দ্ধন ও পরিণতির নামই প্রকৃত শিক্ষা। একসঙ্গে শৃঙ্খলার সহিত যাহাতে মানবের পূর্ণশক্তির বিকাশ লাভ করিতে পারে, তাহাকেই আমরা সমীচীন ও সুচিন্তিত শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিব।

এক্ষণে এই শিক্ষাদান ও মনুষ্যগঠনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী কে? ভাবী জীবনে চরিত্রবান্, শক্তিসম্পন্ন ও কার্য্যক্ষম হওয়া অথবা অধঃপতিত নির্ম্মম পাষণ্ড হওয়ার জন্য ন্যায়ধর্ম্মশাস্ত্রানু-

সারে কে মূল ? মানবের শিক্ষাশক্তি ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির ন্যায় ভগবদ্দত্ত ও স্বাভাবিক। কাহারও এমন শক্তি নাই যে তাহার বিন্দুমাত্র দান করিতে সমর্থ হন। তবে ভূমির সুফসল বা কুফসল প্রধানতঃ কৃষকের উপর নির্ভর করে, সুসন্তান বা কুসন্তান লাভ প্রধানতঃ জনক-জননী বা অভি-ভাবকের উপর নির্ভর করে।

বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতি সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের সমালোচনা তরঙ্গের উর্ম্মি স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তলদেশ স্পর্শ করে না। বর্ত্তমানে শিশু ও বালকগণের মধ্যে যে দুর্নীতি, মিথ্যা, কদাচার উশৃঙ্খলরূপে ক্রীড়া করিতেছে তাহার জন্য দায়ী কে ? আমরা, না সেই সুকুমারমতি সরলতাময় শিশু ? কে তাহাদের নির্ম্মল হৃদয়ে দুষ্প্রবৃত্তির পঙ্কিলধারা মিশাইয়াছে ? চিরপবিত্র নবস্বর্গাগত মানবশিশু এ ঘৃণ্য কদাচার কোথা হইতে পাইল ? বলিতে চান কি যে তাহারা জন্মক্ষণ হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে ? আমরা স্বয়ং তাহাদিগকে দানব সাজাইয়া তাহাদের রুদ্রমূর্ত্তি দর্শনে ভ্রূকুঞ্চিত করিলে চলিবে কেন ? সমাজের পতনের জন্য, সমাজের হীনতার জন্য, সমাজের দীনতার জন্য দায়ী আমরা—অভিভাবকেরা, পবিত্রমতি শিশুরা নহে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা স্বীয় চরিত্র সংগঠনে

সমর্থ না হইতে পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত সমাজে সুসন্তান লাভ করার চেষ্টা বাতুলতা।

কোন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন 'সন্তানের শিক্ষা পিতামহ ও পিতামহী হইতে সূচিত হওয়াই ঠিক।' উপযুক্ত সময়ে স্বীয়সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, পরিণত বয়সে তাহাদের কদাচারে কলিকাল-মহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া অনুতাপ করায় ফল কি? সোহাগ করিয়া সন্তানের মুখে স্বহস্তে হলাহল প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া কাঁদিলে চলিবে কেন? আমাদের সকলের সাধ—পুত্র আমার চরিত্রবান্ হউক, জ্ঞানবান্ হউক, সমাজের মুখোজ্জ্বলকারী হউক। কিন্তু সে চেষ্টা কৈ? কয়জন মাতা পিতা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন? কোন-রূপে প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই তাঁহাদের ক্রোড়ে বংশদুলাল অবলোকন করাই এখন অধিকাংশ অভিভাবকের বাঞ্ছিত বস্তু। যতদিন না মাতাপিতা স্বচরিত্র গঠনান্তর সন্তানের শিক্ষাদানে চেষ্টিত না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত শিশুর সংসারে ও সমাজে ইষ্টলাভ সুদূরপরাহত।

মুখবন্ধে শিক্ষাসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা উপযুক্ত শিক্ষাদান সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পুস্তকাদি পাঠনের দ্বারা আমরা বালকগণকে যে পরিমাণ

শিক্ষাদান করিয়া থাকি, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাহার লক্ষগুণ তাহারা আমাদের কার্য্যকলাপ ও রীতিনীতি হইতে সর্ব্বদা শিক্ষা করিয়া থাকে। যদি জগতে প্রকৃত কেহ শিক্ষক থাকে তো বালক স্বয়ং। স্বচক্ষে সর্ব্ববিষয় নিরীক্ষণ করিয়া সে স্বয়ং যে শিক্ষালাভ করে, সহস্র উপদেশ ও শত বেত্রাঘাতেও তাহার অণুমাত্র শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়া যায় না। বালকের বাহ্যিক জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্ব হইতে শিক্ষার সূচনা হয়। ভাষা, ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার-বিহার, এমন কি স্বর পর্য্যন্ত শিক্ষাকাল প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহারা স্বয়ং শিক্ষা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে যেমন ঘরের ছেলে তাহার চরিত্র তদনুরূপ হইয়া থাকে, তাহার জন্য কোন অভিভাবকের মাথা ঘামাইতে হয় না। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে শিশুশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র সরঞ্জামের কোনই আবশ্যক হইবে না। শুধু তাহাদের সম্মুখে প্রতিনিয়ত আদর্শরূপে সৎদৃষ্টান্ত দেখাইলে সফল মনোরথ হওয়া যায়।

আমরা কথায় শিশুগণকে বুদ্ধিহীন বা জ্ঞানহীন বলি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বোধ হয় তাহাদের সৎ অসৎ ভাবের উপলব্ধি ও ভাবপ্রবণতা পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা যথেষ্ট প্রবল। আমাদের সামান্য সামান্য কার্য্যকরণ লইয়া তাহারা অনায়াসে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ইহা আমাদের ভাষা নহে, অভিজ্ঞতা।

আমরা যে কত সময় আমাদের চিন্তাহীন ক্ষুদ্র কর্ম্মের দ্বারা তাহাদিগের চরিত্রগঠন করিয়া যাই, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ—অনেক সময় শিশুকে ঔষধ খাওয়াইতে বলি "মিষ্টি ঔষধ" সে আনন্দে তাহা পান করে, কিন্তু তাহার সেই তিক্ত স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের কোমল হৃদয়ে যে প্রবঞ্চনার বীজ ঢালিয়া দিই, তাহা আমরা একবার চিন্তাও করিও না। প্রতিনিয়ত তাহাদের সহিত ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, আদরে সোহাগে নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অভিনয় করিয়া শুধু যে আমরা তাহাদিগকে প্রবঞ্চক করিয়া তুলি তাহা নহে, পরন্তু আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন করিয়া ফেলি। আমরা চাই "পিতাধর্ম্ম পিতাস্বর্গ" হতে, কিন্তু আচরণ করি নারকীর মত। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত সন্তানের সে দৃঢ় ও অচলা-ভক্তি কিরূপে লাভ করিব ?

অনেক সময় বেত্রাঘাতে বা তদ্বিধ শাস্তি দানে আমরা জোর করিয়া সন্তানের নিকট হইতে সম্মান আদায় করি। তাহাতে ফল এই হয় পিতাপুত্রে মধুর সম্বন্ধস্থলে আমরা ঘাত ও ঘাতকের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বসি। সন্তানের চরিত্র গঠনে সুশাসন আবশ্যক করে সন্দেহ নাই তবে সে শাসন বেত্রদণ্ডের পরিবর্ত্তে স্নেহের শাসন হওয়া চাই। বালকের বাধ্যতা অবশ্যই অভিপ্রেত, তবে সে বশ্যতা যেন বালকের স্ব-ইচ্ছা-

প্রণোদিত হয়। আদর ও অভিমান মানবের সুকুমার বৃত্তি। সুকুমার সন্তানের উপর ইহার প্রভাবও বিশেষ ক্রিয়াশীল। দোষহীন বিষয়ে অগাধ স্নেহ দেখাইয়া, দুষ্ট বিষয়ে অভিমান দেখাইলে সম্যক্ ফললাভ হইতে পারে আমাদের বিশ্বাস। উদাহরণস্বরূপ শিশুর আনন্দময় নর্ত্তন ক্রীড়া দেখিয়া স্নেহে তাহাকে সহস্র চুম্বন করিলেন, আবার তাহার অবাধ্যতা বা অন্য কোন অসদাচরণ দেখিয়া তুল্যরূপে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। ইহাতে তাহার শাসনকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু কোন কার্য্যের আদেশ করিলে সে যদি তাহা পালনে পরাঙ্মুখ হয় তাহা হইলে যে কোন উপায়ে হউক তাহার দ্বারা সে কাজ সম্পন্ন করাইতেই হইবে, তাহাতে যদি বেত্রাঘাতের প্রয়োজন হয় নিঃসঙ্কোচে করিতে পারেন। বালক যেন সম্যক্ বুঝিতে পারে, মাতা-পিতার আদেশ পালন করিতেই হইবে। তাহার জেদ সে প্রভুত্বকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে। আবার এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকা চাই যেন আমরা বালকগণকে অযথা আদেশ পালনে বাধ্য না করি। অনেক সময় আমরা তাহাদের দৈবকৃত কর্ম্মের জন্য যথেষ্ট শাসন করিয়া থাকি, তাহা কোন ক্রমেই উচিত নহে। অপর কেহ সন্তানের উপর অত্যাচার করিলে অনেক জননী 'আনক' করিয়া বিনা অপরাধে আবার তাহাকেই প্রহার করেন, ইহা

সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। আবার কখনও বা সামান্য কারণে গুরু-দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া ও গুরু কারণে লঘু দণ্ড দিয়া থাকেন বা কোন দণ্ড বিধান করেন না। ইহা উভয়তঃ দূষণীয়। ক্ষেত্র বিশেষে সামান্য সামান্য বিষয়ে প্রকৃতির শাসনের উপর নির্ভর করাও মন্দ নহে। প্রকৃতির শাসন নির্ম্মম, কঠোর ও ওজন করা। দীপ শিখায় শিশু যতবার হস্ত প্রদান করিবে উহা তুল্যরূপে দগ্ধকারী হইবে, এবং সে শাসন শিশুর বদ্ধমুল হইয়া যাইবে। তখন সে বিষয়ে আর উপদেশ দানের আবশ্যকতা থাকিবে না।

অনেক ক্ষেত্রে মাতা পিতা অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়া সন্তানের প্রত্যেক ত্রুটিতে কঠিন কায়িক দণ্ডের ব্যবস্থা করেন. ইহাতে সন্তান শাসিত হয় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিকৃষ্টস্বভাব, ভীরু ও প্রাণহীন করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে তাহার মানসিক বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহাতে মাতা-পিতার প্রতি বিদ্বেষভাব বা বিরক্তি জন্মায়। একবার শাসনমুক্ত হইতে পারিলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ঢালিয়া দেয়। যতদূর সম্ভব তাহাদিগের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া সুপথে চালিত করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

শিশুরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার জন্য অনেক সময় অযথা অভিযোগ করিয়া থাকে, উহার প্রশ্রয় দেওয়া কোন-

রূপে যুক্তিযুক্ত নহে। আব্দার, বায়না, কান্নাকাটি বালকের স্বভাবসিদ্ধ দোষ। ইহা প্রকৃতিগত প্রভুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা মাত্র, কোনক্রমে তাহার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। শৈশব হইতেই বালকের মিথ্যাকথন সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক জনক-জননী বালকের সেরূপ আচরণে তাহাকে শাসন না করিয়া তাহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতি শৈশবেই কোন অভ্যাস মজ্জাগত হইতে দেওয়া উচিত নহে। পোষাক পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে নির্ব্বাচনভার বালকের উপর দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে তাহার বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বাল্যকাল হইতে আত্মসম্মান ও আত্মশ্রদ্ধা যাহাতে শিশুগণের মনে উন্মেষিত হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার অবলম্বন করা আবশ্যক। সে যে ক্ষুদ্র, সে যে হেয়, এ ভাব কোন ক্রমেই তাহার মনে যেন জাগরূক হইতে না পারে। শাসন ও উপদেশকালে তাহার আত্মসম্মানের উপর ঘা দিয়া কথা বলাই উক্ত ভাব জাগরিত করার পন্থা। পুরস্কার গুণ দর্শনের দ্বারা, শৈশব হইতে শিশুর আকাঙ্ক্ষার শিখা উদ্দীপ্ত করা অবিধেয়। প্রতিযোগিতায় পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ে কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ হইলেও পক্ষান্তরে বিদ্বেষের ভাব উদ্দীপ্ত হয়। সুতরাং প্রতিযোগিতা অপেক্ষা সহানুযোগিতা

উত্তম। শিষ্টাচার বিনয়াদি গুণ উপদেশসাপেক্ষ নহে, আদর্শ ও সংসর্গসাপেক্ষ।

কোন ক্ষেত্রে, কোন কারণে তাহাদিগের দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য ভূত-পিশাচাদির অলীক ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করা একান্ত বিষময়। শৈশব হইতে শিশু-গণের সরলচিত্তে ধর্ম্মবীজ বপন করা পিতা-মাতার অন্যতম কর্ত্তব্য। জাতি-ধর্ম্মানুযায়ী দেবার্চ্চনায় উৎসাহ দান, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক।

মাতা-পিতার আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য—সঙ্গ নির্ব্বাচন। আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশে কেন? সর্ব্বদেশেই অধিকাংশ শিশুই সঙ্গদোষেই উৎসন্ন যাইয়া থাকে। ক্রীড়া ভ্রমণাদিতে যতদূর সম্ভব অভিভাবকমধ্যে কাহারও শিশুগণের সমভিব্যাহারী হইতে পারিলেই ভাল হয়। একান্ত পক্ষে তাহাদের ক্রীড়া-কৌতুকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি ও তাহাদিগের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের শৃঙ্খলতা সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পৃথক্ পৃথক্ রূপে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে, সে কারণে সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান শিক্ষার দুই একটী অবতারণা করিয়া আমরা এ প্রবন্ধের শেষ করিব। সুযোগগ্রাহিত্যেই হউক বা ব্যবস্থা-

বৈগুণ্যেই হউক বা অবস্থাঅস্বাচ্ছল্যেই হউক, আমাদের দেশে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্ত 'একঘেয়ে' হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা শুধু অভিভাবকের কর্ত্তব্য মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে, চিন্তা স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে উচ্চ শিক্ষা-সোপান পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক বাঁধা নিয়ম চলিয়াছে। সাহিত্য বিজ্ঞানে বালকের বিন্দুমাত্র আসক্তি থাক্ বা না থাক্, তাহাকে পূর্ণ যৌবনকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত নিয়মে পড়িতেই হইবে। তাহাতে এক শ্রেণীতে যদি বর্ষত্রয় অতিবাহিত করিতে হয় তাহাতেও অভিভাবকের আপত্তি নাই। মানুষ মাত্রেরই প্রকৃতি ও শক্তি কোন ক্রমেই এক হইতে পারে না। অদ্ভুত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে প্রথিতনামা বিজ্ঞানবিদ্ হইবে ইহার অর্থ কি? যে ছেলে সহজেই আঁকতে শেখে, সে যে ভাল অঙ্ক কসিতে পারিবেই তাহার কি প্রমাণ? সুতরাং শৈশবকাল হইতে বালকের আসক্তি ও শক্তি কোন্ মুখীন তাহা সম্যকরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুরূপ শিক্ষাদানই বিধিসঙ্গত। সাধারণ শিক্ষায় যে বালকের অভিনিবেশ হয় না, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে হয়ত দেখা যায় যে, সে অন্যবিধ শিল্প বা বিজ্ঞানে সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সামান্য চিন্তা ও অনুসন্ধানের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য একটা অমূল্য

জীবনকে ব্যর্থ করিয়া তাহার উন্নতির পথে কণ্টক হইয়া সমাজের কলঙ্কস্বরূপ করিয়া রাখা কি নিদারুণ নির্ম্মমতা নহে ?

দ্বিতীয়তঃ ভাষাদি শিক্ষাই কি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ? নৃত্যগীত, অঙ্কন প্রভৃতি কলাবিদ্যা কি শিক্ষাঙ্গভুক্ত নহে ? কিন্তু কৈ, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি কৈ ? যত্ন থাকা দূরে থাকুক, অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই উক্ত কলাবিদ্যায় কোন বালকেরই স্বভাবতঃ আসক্তি লক্ষিত হইলে, অভিভাবকগণ উৎসাহদানের পরিবর্ত্তে নির্য্যাতিত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। অথচ তাঁহারা সমাজে সঙ্গীতজ্ঞ বা কলা-বিদ্যাবান্ ব্যক্তির ভূয়সি সম্মান দান করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় ভগবদ্দত্ত যে যে সৎ-বৃত্তি বালকের হৃদয়ে সঞ্চিত আছে সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার পূর্ণ বিকাশ করিবার চেষ্টা করা অভিভাবক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে শুধু যে সে ভবিষ্যজীবনে শান্তি ও সুখলাভের অধিকারী হয়, মাত্র তাহা নহে, অপিচ তাহার বুদ্ধিবৃত্তিরও পরিপুষ্টতা লাভ হয়।

তৃতীয়তঃ বর্ত্তমানে ভাল ছেলের অর্থ নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আসক্তিবান্, ক্রীড়া-কৌতুকহীন, লাজুক, ভীরু কার্য্যকুশলতা-হীন জড়ভরত মাত্র। কেবলমাত্র সাহিত্যাদি চর্চ্চায় মস্তিষ্কের কিছু উন্নতি সাধন করা যায় বটে, মানুষ গড়া যায় না।

আমরা এমনি অন্ধ-স্নেহশীল যে যতদিন সম্ভব সন্তানকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর চক্ষে দেখিয়া অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিতে চাহি, ফলে এই হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিকারী জাতশ্মশ্রু যুবকও অজাতদন্ত শিশুর ন্যায় কর্ম্মহীন অপোগণ্ডরূপে রহিয়া যায়।

সংসারের ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসিমা প্রভৃতি শিশুর সামান্য পতনাদিতে এমন 'আহা উহু' 'গেছে গেছে' চিৎকার করেন, যাহাতে বালকের সাহস জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়া যায়। জাপান প্রভৃতি সুসভ্য দেশে কিন্তু উক্তরূপ পতনাদিতে অভিভাবকেরা কোন ক্রমেই হস্তক্ষেপ করেন না, অধিকন্তু বালক ক্রন্দন করিলে তাঁহারা পরিহাস করেন। বালকে বালকে দ্বন্দ্বের পর ক্রন্দন করিয়া গৃহে আসার ন্যায় অপমানের বিষয় আর কিছুই নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ, কষ্টসাধ্য কার্য্যে নিয়োগ ও সাহসিক কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হওয়ায় উৎসাহ দান অভিভাবক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। শৈশবের সীমা উত্তীর্ণ হইলেই বালককে আত্মনির্ভর করিবার জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত। সৎকার্য্যে উৎসাহদান নির্ম্মল আনন্দে প্রফুল্লিত ও ভগবৎচিন্তায় ভক্তিমান করাই সন্তান পালনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

দেশের বর্ত্তমান জীবনসঙ্কটে অধিকাংশ পিতাই উদরান্ন-

সংস্থানে এরূপ ব্যস্ত থাকেন যে, সন্তান পালন ও শিক্ষার অবসর তাঁহাদের ভাগ্যে অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ের ভার জননীগণের গ্রহণ করাই সমধিক সুবিধা।

স্বাস্থ্য-রক্ষা

ধর্ম্ম ও কর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান উপায় সর্ব্বপ্রযত্নে শরীর সুস্থ রাখা। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। শরীর সুস্থ না থাকিলে, সবল দেহ ধারণ করিতে না পারিলে সংসারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসারের অভাব অভিযোগ পূরণ করাই যখন অসম্ভব হয়, তখন অসুস্থ শরীরে সৎচিন্তা, উচ্চ চিন্তা বা সৎকার্য্য করিবার সাহস বা ক্ষমতা আশা করা একরূপ অসম্ভব। তাই সুস্থ ও সবল দেহরূপ গৃহে আত্মাকে সযত্নে রক্ষা করা আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। শরীর রক্ষার জন্য আমাদের যাহা একান্ত আবশ্যক তাহাই সংগ্রহ করিয়া নিজ শরীরকে পালন করাই ধর্ম্ম এবং তদতিরিক্ত আহার বিহার প্রভৃতি সমস্তই অধর্ম্ম। এখন এই স্বাস্থ্য রক্ষার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ কি? প্রাতরুত্থান, বিমল বায়ু সেবন, সুপথ্য গ্রহণ,

ব্যায়াম চর্চ্চা, সুনিদ্রা এবং জিতেন্দ্রিয়ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান অঙ্গ। ইংরাজী প্রবচনে বলে "ভোরে উঠিলেই সুস্থ, সবল ও ধনবান্ হওয়া যায়।" ইহা যে শুধু ইংরাজদের মত তাহা নহে, আমাদের দেশের মুনি ঋষিগণও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। তাহার পর দন্তধাবণ একটী সামান্য ব্যাপার নহে, বর্ত্তমান স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বলিতেছে দন্তরোগ হইতে অতি কঠিন কঠিন রোগ সমুদয় উৎপন্ন হইতে পারে। তাই সর্ব্ব প্রযত্নে ভাল করিয়া মুখ ধোওয়া উচিত। মল-মূত্র-ত্যাগ বাসগৃহ হইতে বহু দূরে করা কর্ত্তব্য। আর কখন যেন বেগ ধারণ করা না হয়। এই সব উপদেশ আমাদের আর্য্য চিকিৎসকগণ ভুয়োভুয়ঃ দিয়া গিয়াছেন।

নিয়মিত সাত্ত্বিক আহার প্রভৃতি না করিলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না। এক দিনেই যখন দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না, তখন যতটা সম্ভব আমাদের আহারে বিহারে সংযমী হওয়া উচিত। জীবন ধারণের উপযুক্ত ভোজন করা এবং অকালে স্ত্রী-সঙ্গ না করাই উচিত। সাধারণ ভাবে ঐ সব সাধনে স্বামীস্ত্রী মনোনিবেশ করিলে কালে আমাদের স্বাস্থ্য সম্পদ ফিরিয়া আসিবেই আসিবে।

প্রচুর আহার্য্যের অভাবেই আমাদের দেহরক্ষা অসম্ভব হইতেছে এবং দেহ নানারূপ ব্যাধির আবাস ভূমি হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহা নহে। কিন্তু পুষ্টিকর সহজপাচ্য এবং সাত্ত্বিক আহারের অভাবেই আমরা স্বাস্থ্য-রত্ন হারাইতেছি। অতি ভোজন রোগের মূল। "উনো ভাতে দুনো বল ভরা পেটে রসাতল" এসব প্রসিদ্ধ প্রবচন মা লক্ষীরা নিশ্চয়ই জানেন। খাদ্য-দ্রব্য পুষ্টিকর হইলে পরিমাণে কম হওয়া চিন্তার বিষয় নয়। বরং সকল দেশের স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞগণই ক্ষুধা রাখিয়া বারে অধিক অথচ পরিমাণে কম খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দিয়া থাকেন। আমাদের দেশের রমণীগণের অনেকেরই ধারণা ছেলে মেয়েকে বেশী খাওয়ালেই বল বৃদ্ধি হয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সন্তানদিগকে অতি ভোজন করাইয়া নষ্টস্বাস্থ্য করেন। এধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্মক সেকথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আজকাল দেশের অনেকেই বৈদেশিক ভাবাপন্ন হইয়া নানারূপ অনাচারে ও অত্যাচারে প্রকৃত স্বাস্থ্যরক্ষার মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন চিকিৎসকগণও নানারূপ রোগের জন্য রোগ প্রতিশেধক অনেক ঔষধাদির আবিষ্কার করিতেছেন। এই সকল ঔষধ সেবনে রোগীগণ অনেক সময় মরণের হাত হইতে সাময়িক রক্ষা পাইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ্যতা অনুভব

করেন। কিন্তু কোন শুদ্ধাচারী প্রকৃত ব্রহ্মচারী নানা রোগে আক্রান্ত হইবেন না বা কখন সামান্য রোগে আক্রান্ত হইলেও বিনা ঔষধে প্রাকৃতিক নিয়মে সুস্থ হইয়া উঠিবেন। জীবন ধারণের প্রধান উপাদান নির্ম্মল বায়ু ও পরিষ্কার জল সেবন। শুদ্ধাচারী দরিদ্রের সংসারে আহার্য্য যাহা সংগ্রহ হয় তাহাই আহার করিলে সচ্ছন্দে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়।

যে খাদ্য ক্ষয় পূরণ বা দেহের পুষ্টি সাধন না করিয়া নানা রোগ উৎপন্ন করে তাহাকে খাদ্য বলা যায় না। আহার্য্য মাত্রেই সুখাদ্য নয় তাই অনেক বিবেচনা করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। মোটকথা সাত্বিক আহারে, ব্রহ্মচর্য্য পালনে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় শরীর যেরূপ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়, কোন তামসিক খাদ্য প্রচুর পরিমাণে আহার করিলেও শরীরকে সুস্থ রাখা যায় না, অধিকন্তু দেহখানিকে নানারূপ রোগের আবাস ভূমি করা হয়। তাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য শরীরকে নানা রোগের হাত হইতে রক্ষা করিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা। শরীর ভাল থাকিলে সৎচিন্তা, উচ্চ চিন্তা ও সৎকার্য্য প্রভৃতিতে আনন্দ আসিবে এবং কঠিন কার্য্য সম্পাদনে অবসাদ আসিবে না বরং সমস্ত কর্ম্মেই আনন্দ হইবে।

রূপ

রূপ ভগবানের দেওয়া জিনিস। রূপবান্ বা রূপবতী হওয়া অবশ্যই তাঁহার আশীর্ব্বাদ। মানুষ মাত্রেই রূপ ভালবাসে, রূপের আদর করিয়া থাকে; তাই বলিয়া রূপই একমাত্র জগতের সারবস্তু নহে। ইহাত মানুষদেহের আবরণ মাত্র। অনেক সময় দেখা যায় অনেক জ্ঞানহীনা নারী রূপের গর্ব্বে উশৃঙ্খলা হইয়া যান, তাহা কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। আবার রূপহীনতার জন্য কেহ দায়ী নয়, তাহাতে কাহারও হাত নাই। ভগবান যাঁহাকে যেরূপ করিবেন তাঁহাকে সেইরূপ হইতেই হইবে। সুতরাং নিরপরাধাণা রূপহীনাদের গঞ্জনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। এ জগতে সৃষ্টদ্রব্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যা কিছু দেখিতে সুন্দর তাহাই শ্রেষ্ঠ নহে। সৌন্দর্য্যহীন বহু দ্রব্য আমাদের পরম কল্যাণকর। সুতরাং সুন্দরী রমণী যে নারী-জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠা ইহা বলা যাইতে পারে না। যেমন সুন্দর পুষ্পের সহিত সুগন্ধমিশ্রিত থাকিলে সকলেই সেই ফুল ভালবাসে, সেইরূপ সুন্দরীরা সদ্‌গুণের আধার হইলে সকলের আদরণীয়া হন। আবার সৌন্দর্য্যহীন পুষ্প সুগন্ধময় হইলে লোকে যেমন তাহার আদর করে ও গন্ধহীন সুন্দর পুষ্পের অনাদর করে, সেইরূপ কুরূপাও গুণবতী হইলে সকলে

তাঁহারই যত্ন করিয়া থাকে। গুণহীনা সুন্দরীর কেহ সমাদর করে না। স্ত্রীলোকের রূপই বল, সৌন্দর্য্যই বল, গুণই বল বা গরিমাই বল, সবই ত স্বামীর জন্য, নিজের জন্য ত নহে; সুতরাং উক্ত রূপ বা গুণ সে ত স্বামীর বস্তু, তাহাতে নিজের গর্ব্ব করিবার কি আছে? আমাদের মতে যাঁহারা রূপবতী তাঁহারা স্বীয় সৌন্দর্য্যের সহিত সহস্রগুণ যুক্ত করিয়া 'মণি-কাঞ্চন' সংযোগের ন্যায় অতুলনীয়া হ'ন, এবং যাঁহারা রূপ-হীনা তাঁহারা ততোধিক যত্নে স্ত্রীজাতিসুলভ অন্যান্য গুণের অধিকারিণী হইয়া তাঁহাদের রূপহীনতার কলঙ্ক ঢাকিয়া ফেলুন, তাহা হইলে সংসারজীবন সার্থক হইবে।

সহিষ্ণুতা

সহিষ্ণুতা বা সহ্যগুণের তুলনা করিতে হইলে সাধারণতঃ লোকে ধরিত্রী বা পৃথিবীর সহিত তুলনা করিয়া থাকে। তাহার কারণ জগতের সকল সৃষ্টি সহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করে। কত আঘাবিঘা কত ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া যে একটী ফলবান্ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিতেছি। সেইরূপ এ সংসারে কত আপদ্ বিপদ্, অভাব অনাটন, আধিব্যাধি, দুঃখ দৈন্য নীরবে সহ্য করিলে, পরিশেষে

ভগবানের আশীর্ব্বাদে সুখ শান্তি লাভ করা যায়; যাঁহারা সামান্য দুঃখ কষ্টে অস্থির হইয়া পড়েন তাঁহারা কখনই স্থায়ী সুখ লাভ করিতে পারেন না। আজ তোমার কষ্ট হইয়াছে, অভাব হইয়াছে, সহ্য কর। কাল আবার ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার সুখের দিন আসিবে। অনেক সময় আমাদিগের কষ্ট হিংসা হইতে উৎপন্ন হয়। অমুক ভাল গহনা পরিতেছে, অমুকের কত ঐশ্বর্য্য, আমার কিছুই নাই; কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিও অমুকের একদিনে হয় নাই। অমুকদের অবস্থাও একদিন ভাল ছিল না। ক্রমশঃই হইয়াছে। তুমিও যদি একান্তমনে ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সুখের দিন তোমারও আসিবে। ভারত পুরাণ নাটক নভেল সকল পুস্তকেই ধৈর্য্যহীনতায় নাশ আর সহিষ্ণুতায় সুখের উদাহরণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সীতা দেবী যদি স্বর্ণ-মৃগের জন্য অসহিষ্ণু না হইয়া উঠিতেন তাহা হইলে বোধহয় তাঁহার এমন সর্ব্বনাশ ঘটিত না। আবার অহল্যা সহিষ্ণুতার মূর্ত্তিরূপে যদি পাষাণ হইয়া না থকিতেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীরাম-চন্দ্রের পদরেণু পাইতেন না। বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণ-কান্তের উইলে এ বিষয়ে সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। সূর্য্যমুখীর সহিষ্ণুতাই তাঁহাকে তাঁহার সোনার সংসার ফিরাইয়া দিল, আর ভ্রমরের অধৈর্য্যই একটী বর্দ্ধিষ্ঠ বংশ

উৎসন্ন গেল। সময়ে সময়ে আমাদের উপর এমন বিপদের বোঝা আসিয়া পড়ে যে তখন মনে হয় সর্ব্বনাশ হইল, এযাত্রা রক্ষা হইল না। কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অচিরকাল মধ্যে বিপদের মেঘ কাটিয়া সুখ-চন্দ্রের উদয় হয়। দৈবযোগে তুমি যদি নিঃস্ব বা চরিত্র-হীন স্বামীর হাতে পড়িয়া থাক, অথবা গঞ্জনাময় সংসারে আসিয়া থাক, নীরবে সহ্য কর, প্রতিবাদ করিও না, প্রতি-কলহ করিও না। দেখিবে মঙ্গলময় ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার সব অশান্তি দূর হইবে। তোমার সংসার সুখ-শান্তিতে পূর্ণ হইবে। আর যদি সাময়িক যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্বামীর সংসার ভাসাইয়া দিয়া পিতৃ-গৃহে উঠ, সাময়িক সুখ হইতে পারে বটে, কিন্তু আজন্মের সুখ হারাইতে হইবে। অনেক অজ্ঞ অভিভাবক এরূপ ক্ষেত্রে কন্যাদিগকে উক্তরূপ প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রশ্রয়ে যে কন্যার সর্ব্বনাশ করা হইতেছে তাহা তাঁহারা চিন্তাও করেন না।

শৃঙ্খলতা

সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খলতা সংসার-জীবনের একটী অতি আবশ্যকীয় গুণ। ইহা ব্যতীত সুব্যবস্থায় সংসার চলা

অসম্ভব। সংসারের কাজ বা সংসারের দ্রব্য একটী দুইটী নয়, বহু। যদি নিয়মিতরূপে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংসাধিত ও সংরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে এমনই 'এলো-মেলো' হইয়া যায় যে বহু পরিশ্রমেও কোন বিষয় সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে না। শৃঙ্খলতার অভাবে কোন কার্য্য অসম্পন্ন, কোন দ্রব্য অব্যবহার্য্যরূপে থাকিয়া যায়। বৃহৎ পুস্তকের সূচী না থাকিলে যেমন তাহাতে লিখিত বিষয়গুলি সহজে ঠিক্ করা যায় না, কেবল পাতা উল্টাইয়া মরিতে হয়, সেইরূপ সংসারের শৃঙ্খলতা না থাকিলে সাংসারিক কার্য্য ও দ্রব্যাদির বিষয় কিছুরই হিসাব থাকে না। কেবল ছুটা-ছুটী খোঁজাখোঁজি ও ঝগড়াঝাটি করিয়া মরিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা গৃহের লক্ষ্মী, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের দেবতা। শৃঙ্খলতাহীনা গৃহিণীর সংসারে কখনও লক্ষ্মীর বাস থাকিতে পারে না। সুতরাং যে সংসারে বিলি বন্দোবস্ত নাই সে সংসার শীঘ্রই লক্ষ্মীছাড়া হইয়া পড়ে। লক্ষ্মীস্বরূপিনী হইয়া লক্ষ্মীছাড়া হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহাপেক্ষা আর কি নিন্দার আছে? সুশৃঙ্খলা রাখিতে গেলে গৃহিণীর খুব হুঁস্ থাকা চাই ও সঙ্গে সঙ্গে আলস্যহীনা হওয়া দরকার। কখন কি কাজ করিতে হইবে, কি কাজ হইতেছে কি হইতেছে না সর্ব্বদা খেয়াল রাখা চাই। কোথায় কোন্ জিনিস

গেল, কোথায় কোন্ জিনিস রহিল সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। এবং গৃহকার্য্যাদির শেষে যতক্ষণ না সংসারেব সমুদয় দ্রব্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনক্রমেই বিশ্রাম লাভ করিবেন না। শৃঙ্খলতা যেমন কার্য্যে প্রয়োজন, বাক্যে ও ব্যবহারেও তদনুরূপ। কোন বিষয় পরিচয় করিতে গেলে প্রথমতঃ স্বরের শৃঙ্খলতা চাই। অযথা চিৎকার বা অনাবশ্যক মৃদুতার প্রয়োজন নাই। সম্পর্ক ও সময় অনুসারে কণ্ঠস্বরের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হইবে। শাশুড়ীর সহিত সংসারিক বিষয়ের পরিচয়ে যে স্বর আবশ্যক, সন্তানকে শাসন করিতে গেলে সে স্বর ব্যবহার করিলে চলিবে না। আবার সন্তান শাসনের স্বর কৌতুক-প্রসঙ্গে প্রযোজ্য নহে। আবার মাথামুণ্ড না রাখিয়া কোন বিষয়ে হাউ হাউ করিয়া পরিচয় করিতে গিয়া খেয়া হারাইয়া ফেলা সমধিক দূষণীয়। যাহাকে দেখিয়া আবক্ষ ঘোমটা দেও, তাহার সমক্ষে বা পরোক্ষে ঘোমটার ভিতর হইতে লজ্জাহীনার ন্যায় চিৎকার করা বিধিসঙ্গত নয়। পক্ষান্তরে যাহার সহিত কথা কহিবার সম্পর্ক তাহাকে দেখিয়া কলা-বৌ হওয়াও দূষণীয়। এইরূপ আহার নিদ্রা সর্ব্ব বিষয়ে সমান শৃঙ্খলতা থাকা আবশ্যক।

বিলাসিতা

বিলাসবাসনা মানবের একরূপ দেহধর্ম্ম বলিলেও চলে। এ সংসারে সকলেই আপন আপন সুখস্বচ্ছন্দ খোঁজে। সুতরাং দেহী মাত্রেই দেহের স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু দেহ লইয়াই সংসার নহে। দৈহিক সুখবিধান ছাড়া সংসারে অনেক গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। সুতরাং দৈহিক সুখের জন্য সে কর্ত্তব্য ভাসাইয়া দিলে চলিবে কেন? দেশ কাল অনুসারে আমাদের সংসারে ক্রমশঃই বিলাসিতা প্রবেশ করিতেছে। ইহা কোনক্রমেই মঙ্গলজনক নহে। বিলাতী বিবির আদর্শ দেখিয়া হিন্দুনারীর কি বিবি সাজা শোভা পায়? বিশেষতঃ বিলাসসজ্জা সর্ব্বথা কুৎসিত ভাব উদ্দীপক। কোন্ লজ্জায় কুলবধূরা বিলাসিনী সাজিয়া, শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, শাশুড়ী, ননদিনী প্রভৃতির সম্নে বাহির হন? শুনিয়াছি সে কালে আর্য্যবধূগণ সজ্জিতা হইয়া সাধারণের সমক্ষে আসিতে একান্ত সঙ্কুচিতা হইতেন, ইহাই নারী-চরিত্রের পবিত্র মধুরতা। জগজ্জননী জগদম্বা, ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী হইলেও শ্মশানবাসী শিবের বল্কলপরিহিতা গৃহিণীরূপে বিরাজ করিতে ভালবাসিতেন। বিলাসিতা-উপযোগী বেশ ভূষা হিন্দু বধূদিগের পক্ষে লজ্জার কথা। ইহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ইহাতে অনাবশ্যক অর্থব্যয়, সময়ক্ষেপ,

অপর পক্ষে শরীর নষ্ট হয়। তবে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য অঙ্গমার্জ্জনাদি ও পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান, কেশবিন্যাসাদি যাহা একান্ত আবশ্যক সে গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান সামাজিক রীতি অনুসারে মর্য্যাদা রক্ষার কারণ মূল্যবান্ বসন-ভূষণের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ভগবৎকৃপায় যাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল সময় বিশেষে তিনি তাহা সম্ভবমত ব্যবহার করিতে পারেন। তাই বলিয়া দরিদ্র গৃহিণী যেন সর্ব্বস্বান্ত করিয়া উক্তরূপ বসন ভূষণ স্বামীর নিকট দাবী না করেন। ভদ্রসমাজে গমনোপযোগী সাদাসিদা পরিচ্ছন্ন বসনাদি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। স্বামীর বংশমর্য্যাদা ও গুণগৌরবই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার—'সোনাদানা' নহে। নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর বুনো রঘুনাথের সহধর্ম্মিণী গঙ্গার ঘাটে পরিহাসকারিণী রমণীগণের প্রতি আপনার বাম হস্তের লাল সূতা দেখাইয়া সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন "এই সূতো যে দিন ছিঁড়বে সেইদিন নবদ্বীপ অন্ধকার হয়ে যাবে।" আমাদের শেষ কথা এই যে অর্থে বিলাসিনী শব্দ ব্যবহৃত হয়, সকলেই জানেন তাহা অতি ঘৃণ্য। আমাদের বিশ্বাস পবিত্র হিন্দুকুলের মঙ্গলময়ী বধূরা সাধ করিয়া কখনও সে আখ্যা গ্রহণে অভিলাষিণী হইবেন না।

আলসতা

বিলাসিতা হইতেই অলসতা আসে। আলস্য মনুষ্য-জীবনের প্রধান শত্রু। ইহা হইতে যে সংসারের কত ক্ষতি হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। পৃথিবীতে এমন কোন আপদ্ বিপদ্ নাই যাহাতে সংসারে এতদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হয়। ইহা শুধু শরীরকে নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হয় না, মনকেও তুল্যরূপে কলুষিত করে। মেয়েলি ছড়ায় আছে "সন্ধ্যায় শয়ন করে প্রভাতে নিদ্রা যায়, চাউল মৎস্য ধুয়ে যেবা দুয়ারে ফেলায়" ইত্যাদি সমুদয়ই আলস্যের চিহ্নজ্ঞাপক এবং ইহার ফলে লক্ষ্মীত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। আলস্যপরায়ণা গৃহিণীর সময়ে সুশৃঙ্খলতার সহিত গৃহকার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। কাজেই গুরুজনের সেবা, সন্তানপালন প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে হয় না। সংসার শ্মশানে পরিণত হয়। আলস্যপরায়ণার গৃহে প্রবেশ করিতে মানুষের ঘৃণা বোধ হয়, তা লক্ষ্মী আসিবেন কি করিয়া? একস্থানে মল-মূত্র, কোন স্থানে স্তূপীকৃত দুর্গন্ধময় অপরিষ্কৃত শয্যা, অন্যস্থানে গৃহতল আবর্জ্জনাপূর্ণ, সংসারের সকলই যেন বিষাদময় ও উৎসাহহীন। অলসতার এমনি প্রভাব যে সে স্বীয় জননী বিলাসিতাকেও গ্রাস করিয়া ফেলে। সে সংসারের সকল সুখ নাশ করিয়া আশ্রয়দাতাকে মৃত্যুমুখে টানিয়া লইয়া যায়। বহু-উপার্জ্জনক্ষম স্বামীও

আলস্যপরায়ণা পত্নীর দোষে চির অস্বাচ্ছন্দ্য ও দরিদ্রতা ভোগ করেন।

ক্ষমা

অলসতা যেমন বিলাসিতার রাক্ষসী কন্যা, ক্ষমা তদনুরূপ সহিষ্ণুতার দেবদুহিতা। সহিষ্ণুতা হইতেই ক্ষমার উৎপত্তি। সর্ব্বংসহা ধরণীর কন্যারূপা হিন্দুললনার সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা স্বাভাবিক। যে সহ্য করিতে পারে সেই ক্ষমা করিতে পারে। জগতে যত মহত্ত্ব আছে ক্ষমার মত মধুর মহত্ত্ব আর কিছুই নাই। ক্ষমা—দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই সমান কল্যাণ করে। এমন মন গলাইয়া দিতে, এমন প্রাণ মাতাইয়া দিতে, এমন আপনার করিতে জগতে আর কিছুই নাই। সহস্র তিরস্কার, শত অত্যাচার, অজস্র লাঞ্ছনায় যে ফল না হয়, একটী ক্ষমায় তাহার সহস্রগুণ ফল হয়। মন খুব উঁচু না হইলে ক্ষমা করা যায় না। ইহাতে নিজে কাঁদিয়া পরকে কাঁদাইতে হয়। এ সংসার ভুল ভ্রান্তি, দোষ ত্রুটীতে পূর্ণ। পদে পদে সর্ব্ববিষয়ের প্রতিবিধান করিতে গেলে সংসারে হাহাকার পড়িয়া যায়। যেখানে দণ্ড বা প্রতিবিধান একান্ত অপরিহার্য্য হয়, সেখানেই দণ্ড দিবে, তদ্‌ব্যতীত ক্ষমার বন্ধনেই সমস্ত

সংসারকে আপনার করিয়া বাঁধিয়া লইবে। জগতে এমন পাষণ্ড কেহ নাই যে ক্ষমার বাঁধন ছিঁড়িতে পারে।

স্নেহ-মমতা

হিন্দুনারীকে স্নেহ-মমতা বিষয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখি না। ইহা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। জগতে সমুদয় রমণীমণ্ডলের মধ্যে এ গুণে তাঁহারা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এমন আপন সুখ তুচ্ছ করিয়া, জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে স্নেহ দেখাইতে বুঝি জগতে আর কেহ নাই ; হিন্দুরমণীর স্নেহের উদাহরণ, মমতার দৃষ্টান্ত লেখনীর বিষয়ীভূত নয়। প্রতিদিন প্রতিক্ষণে সংসারজীবনে প্রতি-নিয়ত উপলব্ধির বিষয়। স্বামীর পরিজনবর্গের জন্য বিশেষতঃ সন্তানের নিমিত্ত সর্ব্বস্বত্যাগিনী মূর্ত্তিমতী মমতা হিন্দু পরিবারের গৃহে গৃহে এ দুর্দ্দিনেও বিরাজ করিতেছে। তবে পাছে বৈদেশিক সংমিশ্রণে পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় আমাদের এই পবিত্র আরাধ্য বস্তু কলুষিত হয় সেই আশঙ্কায় এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিতেছি। আর একটী কথা,

অমৃতও ব্যবহার দোষে গরলে পরিণত হয়, সে বিষয়ে দুই এক কথা বলা দরকার। কিংবদন্তি আছে বানরীরা স্নেহ-পরবশ হইয়া দৃঢ় আলিঙ্গনে স্বীয় সন্তানের জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বভাবতঃ স্বভাবস্নেহপ্রবণহৃদয়া অনেক জননী সন্তানস্নেহে এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের স্নেহান্ধ চক্ষুতে সন্তানের দোষত্রুটী লুপ্ত হইয়া যায়। ফলে তাঁহাদের স্নেহাধিক্যই তাহার সর্ব্বনাশের উপাদানস্বরূপ হইয়া উঠে। অনেক পরিবারের মধ্যে "আলালের ঘরের দুলাল" প্রায় দেখা যায়, শৈশব হইতে অত্যধিক স্নেহে তাহারা এমনি দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে যে, তাহাদের ভবিষ্যজীবন চিন্তা করিলে হৃদয় শিহরিত হয়। যাহাকে তাঁহাবা বুকের ধন ভাবিয়া পালন করিয়া আসিয়াছেন, সেই একদিন আবার তাঁহাদের হৃদয়ের শেলস্বরূপ হইয়া উঠে। সুতরাং সন্তান স্নেহের পাত্র হইলেও সে স্নেহের সীমা থাকা চাই, বন্ধন থাকা চাই, বিধি থাকা চাই। সকল ক্ষেত্রেই স্নেহনিবন্ধন কঠোরতা হইতে নিবৃত্ত হইলে চলিবে কেন? সন্তানের বিস্ফোটক হইলে অস্ত্রচিকিৎসা কষ্টকর বলিয়া কি তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে?

আর একটী কথা, আমরা সময় সময় এই স্নেহবশবর্ত্তী হইয়া সন্তানের প্রতি স্নেহের অত্যাচার সাধন করিয়া থাকি।

সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, শিক্ষিত ও শক্তিশালী হইলে তাহাকে কি আঁচলে ঢাকিয়া রাখা ভাল দেখায়? সে যখন মানুষ হইয়াছে তখন সে আপনার পথে চলুক। তাহার শৈশবে আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিয়াছি, এখন সে তাহার কর্ত্তব্য সাধন করুক। একমাত্র স্নেহপরবশ হইয়া তাহার উন্নতির পথে কণ্টক হইতে যাইব কেন? সে ত ভালবাসা নয়, সে যে শত্রুতা। কর্ম্মসূত্রে দীর্ঘকালের জন্য তাহাকে যদি সুদূর দেশে যাইতে হয়, যাউক। তাহার অদর্শনজনিত দুঃখ নীরবে সহ্য করাই প্রয়োজন! স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে ভগবানের নিকট তাহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনাই তখন মাতাপিতার একমাত্র কর্ত্তব্য। জীবনের ব্রত সাধন করিতে যদি তাহার সহস্রাধিক বার মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয়, হউক। তাই বলিয়া কি জনক হইয়া পালন করিয়া তাহাকে মানুষ হইতে দিব না? মৃত্যুত দেহীর অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। যদি মৃত্যু আসে, গৃহে রাখিয়া আঁচলে ঢাকিয়া তাহাকে কি রক্ষা করিতে পারিবেন? অন্ধস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালীজাতি বাঙ্গালীই রহিল, মানুষ হইতে পারিল না। শিশু যতদিন শিশু থাকে ততদিন সে জননীর অঞ্চলের নিধি, শিশু যুবক হইলে সে ত জন্মভূমির ধন। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সে ধন অপহরণ করা কি পাপ নহে? সেই জন্য বলিতে-

ছিলাম স্নেহেরও বিধি বন্ধন আবশ্যক। যে স্নেহের অমৃতময় সিঞ্চনে শিশুর দেহ গঠিত হইল, সে পবিত্র স্নেহ যেন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে স্বার্থকলুষিত না হয়।

বিনয়

পুরুষের যেমন বাহিরের নানা কাজে নানা লোকের সংস্রবে আসিতে হয়, স্ত্রীলোকগণের তদনুরূপ বাহিরের লোকের সহিত সংস্রব না থাকিলেও একেবারে যে সংস্রবশূন্য তাহা নহে। সুতরাং আচারে ও ব্যবহারে বিনয় যেমন পুরুষের চিরসঙ্গী, স্ত্রীলোকগণেরও উহা ভূষণস্বরূপ। উৎসবাদিতে বাঙ্গালীর ঘরে ভিন্নপরিবারস্থ বহু রমণীর আগমন হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার ভার গৃহিণীর উপরই ন্যস্ত থাকে। সুখ্যাতি অখ্যাতি তাঁহার ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে। উৎসবের বিপুল আয়োজনে তিনি যদি মনে মনে গর্ব্বিতা হন, অথবা তাঁহার অপেক্ষা অবস্থাহীনা অভ্যাগতা স্ত্রীলোকদিগকে তিনি যদি ছোট দেখেন, তাহা হইলে আয়োজন যত বিপুলই হউক না কেন তাঁহার উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। অপর পক্ষে যদি দ্রব্যাদির

আয়োজন অস্বচ্ছলও থাকে, বিনয় সহকারে সকলকে উপযুক্ত-রূপ সমাদর করিলে সে ত্রুটী সহজেই ঢাকিয়া যায়। স্ত্রীলোকের গর্ব্ব অতি ভয়ঙ্কর জিনিস। জগৎলক্ষ্মী ইহা কখনই সহ্য করেন না। যে পরিবারের রমণীরা স্বামী প্রভৃতির আর্থিক উন্নতিতে গর্ব্বিতা হইয়া পড়েন, সে পরিবারে আশু পতন অবশ্যম্ভাবী। লক্ষ্মীর কথায় আছে "গৃহিণী গর্ব্বের ভরে করে কদাচার, অস্তি অস্তি বলি আমি ছাড়ি সে সংসার"। ভগবানের কৃপায় অর্থসাচ্ছল্য হইলে অনেক অবস্থাহীনকে প্রতিপালন করিতে হয়। সে পালন গর্ব্বের সহিত করিলেও প্রতিপাল্যেরা অবনতমস্তকে তাহা গ্রহণ করিবে সত্য, কিন্তু তোমার নিকট উপকার প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা তাহাদিগের মনে উদয় হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রতিনিয়ত বিদ্বেষ-ভাবই জাগরিত হইতে থাকিবে, ফলে এই হইবে যে অর্থব্যয়ে বিনয়াভাবে মাত্র বিদ্বেষভাজনই হইতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি বিনয়ের সহিত তাহাদিগকে সাহায্যদান করা যায় তাহারা তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

স্বাধীনতা

স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা এদেশে নাই বলিলেই হয়। জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীজীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহারা সর্ব্বাবস্থাতেই পিতা, স্বামী, সন্তানাদি করিয়া যে কোন পুরুষের অধীন থাকেন। জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে পুরুষ ও স্ত্রীর দৈহিক গঠনের পার্থক্যে স্ত্রীজাতি যে পুরুষেরই অনুবর্ত্তিনী থাকিবে, ইহাই যেন ভগবৎ-অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী ও পুরুষের মধুর সংমিশ্রণে জীবনের পূর্ণত্ব লাভ হয়। সুতরাং স্ত্রীজাতির পুরুষের বশবর্ত্তী থাকা লজ্জা বা ঘৃণার কথা নহে। বিশেষতঃ শিক্ষিত ও হৃদয়বান্ কখনই স্ত্রীজাতিকে তাঁহাদের অধীন বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন না। হিন্দুশাস্ত্রমতে স্বামী স্ত্রী যখন অভিন্নহৃদয়, তখন স্বামীর মত, স্বামীর ইচ্ছা, সে ত তাহারই মত তাহারই ইচ্ছা। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ অশিক্ষিতা ও স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা, তাহাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে গেলেই পদে পদে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে সংসারজ্ঞানরহিতা অনেক রমণী স্বাধীনভাবে চলিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছেন। বিশেষতঃ এখন যেরূপ দেশকাল তাহাতে স্ত্রীজাতির স্বাধীন-ভাবে ভ্রমণাদিও নিরাপদ্ নহে। যেরূপ তাহাদের উপযোগী

এতদ্দেশীয় মনীষী সমাজতত্ত্ববিদেরা সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। সুতরাং ঋষিব্যবস্থিত নিয়মগুলি আমাদের অবনতমস্তকে পালন করাই কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয় সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর মতানুসারিণী হওয়াই কুলবধূর ধর্ম্ম। একমাত্র পাষণ্ড দুর্নীতিপরায়ণ স্বামীর কবল হইতে স্ত্রীধর্ম্ম বা সতীত্ব রক্ষার বিষয়ে স্ত্রীজাতি স্বাধীন।

লজ্জা

চাণক্য পণ্ডিত বলেন "অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ। সলজ্জা গণিকা নষ্টা লজ্জা হীনা কুলস্ত্রীয়ঃ॥" অর্থাৎ সন্তোষহীন ব্রাহ্মণ, সন্তুষ্ট রাজা, সলজ্জা বারবনিতা ও লজ্জাহীনা কুলবধূর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

লজ্জাই স্ত্রীজাতির রক্ষাকবচ। ইহা স্ত্রীজনোচিত সমুদয় গুণকে বর্ম্মের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। লজ্জাহীনা স্ত্রীলোক সমাজের কলঙ্কস্বরূপ। কবিরা স্ত্রীজাতিকে লজ্জাবতী-লতার সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। পরপুরুষ দর্শনে লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিত থাকাই স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম।

আজ কাল অনেক বিষয়ে ইহার বৈপরীত্য ঘটিতেছে। ঘোমটা লজ্জা নিবারণের একটী বাহ্যিক আচ্ছাদন। ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও অপব্যবহার চলিতেছে। সাধারণতঃ দেখা

যায়, পথেঘাটে স্ত্রীলোকেরা পুরুষ দেখিলেই ঘোমটা দেয়, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, তাহারা একবার পুরুষকে ভাল করিয়া দেখিয়াই ঘোমটাটী দেয়। আমাদের মতে যেখানে পুরুষ আগমনের সম্ভাবনা আছে, পূর্ব্ব হইতেই সেখানে ঘোমটা দেওয়া ভাল। সচরাচর পল্লীগ্রামে বিবাহবাসরে কুলবধূরা হাস্য কৌতুক করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাহা এরূপ অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ হয়, যে ভাষায় বর্ণনার অযোগ্য ; এ প্রথার আশুউচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন। বর যত আত্মীয়ই হউক না কেন, সে ত নবাগত পরপুরুষ বটে। কোন্ যুক্তিতে তাহার সম্মুখে অশ্লীল রহস্যালাপ সঙ্গত হইতে পারে ? স্বামীর সাক্ষাতেও যে ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ আসে, অপরের সাক্ষাতে কিরূপে তাহা করা যায় ? সম্বন্ধে যেই হউক, স্বামী ভিন্ন অপর কোন পুরুষের সহিত ও সম্বন্ধীয় কোনরূপ রহস্যালাপ কুলবধূদিগের কর্ত্তব্য নহে।

ভগ্নীপতি, নন্দাই প্রভৃতিকে লইয়া উক্ত প্রকার পরিহাসাদি প্রচলিত প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু কি সূত্রে বা কোন্ যুক্তিতে যে এরূপ প্রথা প্রচলিত হইল ভাবিয়া পাই না। এ বিষয়ে পুরুষদিগেরও লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মনে হয়, অপরের সাক্ষাতে স্বামীর সহিত হাস্যপরিহাসও লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধ।

বিলাসিতাপূর্ণ বেশভূষা লজ্জাহীনতার রূপান্তর। লজ্জাবতীরা কখনও স্বামীর সম্মুখেও অসঙ্গত লজ্জাহীনতার পরিচয় দিবেন না। পরিবারস্থ অপর সাধারণের শয্যাত্যাগের পরও স্বামীর শয্যায় শায়িত থাকা কর্ত্তব্য নহে। উচ্চভাষ, উচ্চ হাস্য, চঞ্চল গমন প্রভৃতি লজ্জাহীনতার লক্ষণ। স্ত্রীজাতির গমনে, ভোজনে, কথনে ও আচরণে সর্ব্বদা সংযত থাকাই কর্ত্তব্য।

সরলতা

অকপটে নিজের মনোভাব বা মতামত যথাযথ প্রকাশ করার নাম সরলতা। মুখে একখান, মনে একখান ও বাক্যে একরূপ, কার্য্যে অন্যরূপ আচরণ করার নাম কুটিলতা। যাহার মন সর্ব্বদা সৎচিন্তায় পূর্ণ থাকে, যাহার চিত্ত নিত্য আনন্দময়, সরলতা তাহার মুখে স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। কোন গর্হিত কার্য্য গোপন করিতে হইলে প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যে জীবনে কোন মন্দ কার্য্য করে না, তাহার সে পথ অবলম্বন করিবার আবশ্যক হয় না। সুতরাং সরলতাসম্পন্না হইতে গেলে প্রথমে হীন বা নিন্দনীয় কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইবে, নচেৎ সরলতা সাধন অসম্ভব। সমাজে এক-জাতীয়া অতি হীন কুটিলস্বভাবা রমণী আছেন, তাঁহারা

সরলতার ভাণ দেখাইয়া পরের মনে অযথা ব্যথা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বুঝেন সব, অথচ বলিবার সময় এমন ভাব দেখান যেন না বুঝিয়াই সরল ভাবে সমস্ত বলিয়া ফেলিয়াছেন। আন্তরিক উদ্দেশ্য—তাঁহার মর্ম্মাঘাতী কথায় অন্যে অন্তরে দগ্ধ হউক। কুটিলতা অপেক্ষা সে সরলতার ভাণ বড় সাংঘাতিক। সরলতা বিশ্বাসের ভিত্তিস্বরূপ। যদি কাহারও সরলতায় কাহারও বিশ্বাস থাকে, তাহার সমুদয় কার্য্য, সকল বাক্যই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে। সংসারে লোক যতই চতুর হউক না কেন, একদিন না একদিন তাহার চাতুরী ধরা পড়েই। কাজেই দৈনন্দিন জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক চতুরতা বা কুটিলতা তাহার পরিজনবর্গের মধ্যে কাহারও নিকট অজ্ঞাত থাকে না! ফলে এই হয়, যে বিষয় তিনি আন্তরিকতার সহিত সম্পন্ন করেন, সে বিষয়ও লোক সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, সামান্য বিষয়ে কুটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্য স্বামীর নিকট সন্দেহ ও ঘৃণার পাত্রী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। সহজেই তাঁহার মনে এই ধারণা হয়, সামান্য বিষয়ে যে এরূপ ছলনা করিতে পারে, গুরুতর বিষয়েও যে সে একদিন ছলনা করিতে পারিবে না, তাহার প্রমাণ কি? সন্দেহ সংসারে, বিশেষতঃ নারীজীবনে বড় দোষের, বড় ভয়ের

কারণ। তিলেকের সন্দেহ দূর করিতে অনেক সময় একটী জীবন কাটিয়া যায়। মানুষ মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি, দোষত্রুটী হইয়া থাকে। উপস্থিত তিরস্কার হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য কপটতা অবলম্বন করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। সরল চিত্তে আপন ভুল বা ত্রুটী, স্বামী বা পরিজনসমক্ষে প্রকাশ করাই শ্রেয়স্কর। কুটিল ব্যবহারে সন্দেহ উৎপাদন করাইয়া যে নিজেই জন্মের মত দুঃখভাগিনী হন তাহা নহে, যাহার মনে সে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহার জীবনও বিষময় করিয়া তোলা হয়। কার্য্যে, বাক্যে, ব্যবহারে ও চিন্তায় সর্ব্বান্তকরণে যাহাতে পূর্ণ সরলতা থাকে সর্ব্বপ্রথমে সে বিষয়ে যত্নবতী হইতে হইবে। সত্য, সরলতার সহচর ও আশ্রয়। সুতরাং জীবনের সমুদয় আচরণ সত্যপূর্ণ হওয়া চাই।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় আজ কাল বুদ্ধিহীনতাকে সাধারণে সরলতার আখ্যা দিয়া থাকেন। সরল হইতে হইলে যে বুদ্ধিহীন হইতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। সরল হইতে হইলে যে সংসারের সকল সমস্যা, সকল রহস্যই, সকল গোপনীয় বিষয়ই, অকপটে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কোন হেতু নাই। সংসারধর্ম্ম করিতে গেলে, অনেক বিষয় অনেক সময় গোপন রাখার আবশ্যক হয়। সকল বিষয়ই সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইলে

কার্য্যসিদ্ধির অনেক ব্যাঘ্যাত ঘটে। সুতরাং "মন্ত্রগুপ্তি" অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্যগোপন, সংসার-জীবনে একটী সাধনীয় বিষয়। সরলতা অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া সে বিষয়ে লক্ষ্যহীনা হইলে চলিবে না। বিশেষতঃ অনেকেই বিশ্বাস করিয়া তাহার মনের কথা তোমার কাছে ব্যক্ত করিতে পারেন, সরলতার দোহাই দিয়া তুমি যদি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ কর, প্রকারান্তরে উক্ত ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধন করা হয়। গোপনীয় বিষয় যদি ঘৃণ্য হয় তুমি তাহা কদাচ শ্রবণ করিবে না। আর এক কথা, সংসার শ[illegible] ও প্রবঞ্চকে পূর্ণ। সুতরাং তোমার সরলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কেহ তোমার অনিষ্ট না করিতে পারে, সে বিষয়েও তুল্যরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে সরলচিত্তা হইতে গেলে বুদ্ধিহীনার পরিবর্ত্তে সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্না না হইতে পারিলে বিপদের সম্ভাবনাও আছে।

গাম্ভীর্য্য

অনেক সংসারে দেখা যায় এমন এক একটী কর্ত্তা বা গৃহিণী আছেন যাঁহাকে দেখিবামাত্র বাড়ী শুদ্ধ লোক, এমন কি পাড়ার বা গ্রামস্থ অনেক লোক ত্রস্ত হইয়া পড়ে।

তাঁহার কাছে মাথা যেন আপনি নোয়াইয়া পড়ে। অথচ তাঁহাকে কখন কাহাকেও তাড়ন বা পীড়ন করিতে দেখা যায় না। আবার এমনও হয়, হয়ত তাঁহার অসাক্ষাতে অনেকেই তাঁহার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে জল্পনা কল্পনা করে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার সদাশান্ত প্রফুল্ল মূর্ত্তি লইয়া যেমনই উপস্থিত হন, তখনই সকলে গলিয়া যায়। কেন এমন হয়? আমাদের আলোচ্য বিষয় গাম্ভীর্য্য বা রাশ যে ইহার একমাত্র কারণ ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

এখন দেখিতে হইবে, কি কি বিশেষ গুণ থাকিলে, এ সম্মান লাভ করা যায়? উক্ত স্বভাবের লোকের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় ইহারা স্বভাবতঃ বিশেষ ধৈর্য্যশীল। আপদ্ বিপদ্, সম্পদ উৎসব অথবা কলহ বিবাদে ইঁহারা কিছুতেই বিচলিত হন না। ইঁহারা স্বার্থশূন্য, নিজের অভীষ্টসাধনের জন্য কদাচ ইঁহারা অন্যায় বিচার করেন না বা অযৌক্তিক কথা বলেন না। ইঁহারা অল্পভাষী ও মিষ্টভাষী। সাধারণের ন্যায় কোন বিষয়ে ওপরপড়া হইয়া নিজের মতামত প্রকাশ করেন না বা কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন্ না। যখন ইঁহাদের কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ বা মীমাংসার আবশ্যক হয়, তখন তাঁহারা এমন স্বভাবসুলভ মিষ্ট মথায় ও ধীরভাবে সকল বিষয়ের মীমাংসা করেন যে,

বাদী প্রতিবাদী কোন পক্ষই অসন্তুষ্ট হয় না। ইঁহারা কষ্টসহিষ্ণু। অন্যের বিপদে বা উৎসবে আপনার দৈহিক সুখ তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণ যত্নে প্রসন্নমনে তাঁহার কার্য্যোদ্ধার করিয়া থাকেন। ইঁহারা স্বভাবতঃ স্নেহশীলা। ইঁহাদের মিষ্টবাক্য শোকে সান্ত্বনা দিতে, বিপদে উৎসাহ দিতে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ। ইঁহারা সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্না। অতি সহজেই লোকের মনের ভাব বুঝিতে পারেন, এবং লোকের মন বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবহারেই তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া থাকেন। আপন সুখ ঐশ্বর্য্য বা অভাব অভিযোগের বিষয় কদাচিৎ আলোচনা করেন না। কেহ তাঁহাদের কাছে যাইলে তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহার দুঃখের বিষয়গুলিতে সহানুভূতি, ও সুখের বিষয়গুলিতে আনন্দপ্রকাশ করিয়া তুষ্ট করেন। বড় গাছে যেমন বড় ঝড় সয়, তেমনি ইঁহারা সংসার-অরণ্যে বনস্পতিরূপে দুঃখশোকের অনেক ঝড় অনেক আঘাত নীরবে সহ্য করেন। গাম্ভীর্য্যপূর্ণা গৃহিণীর গুটিকয়েক গুণের উল্লেখ করিলাম। সংসারসুখ উপভোগ করিতে হইলে এসব গুণের অধিকারিণী না হইলে চলিবে কেন? আমরা আশা করি, সংসার-জীবনের আরম্ভ হইতে প্রত্যেক পুরমহিলা উক্ত গুণে গুণবতী হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

আত্ম-সন্তোষ

রোগ যেমন স্বভাবতঃ সারিবার মুখে না আসিলে কেবল-মাত্র ঔষধ প্রয়োগে কিছুতেই সারে না, অনেক কঠিন ব্যাধি আবার বিনা ঔষধে সারিতে দেখা যায়, মানুষেরও আত্ম-সন্তোষ বা মনের সুখ আপনা হইতে লাভ না করিলে কেবল-মাত্র উপাদান সংগ্রহে বা ভোগ্যবস্তু লাভে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আবার আত্মসন্তোষশীল ব্যক্তির মনের সুখ সহস্র অভাবের ভিতরও বিরাজ করিতে থাকে। এই পৃথিবীতে কামনারও শেষ নাই, বাসনারও শেষ নাই। যিনি যত ভোগ্যবস্তু পাইবেন তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি না হইয়া বরং আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাজমহিষীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ শুনিবে তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্যেও তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভোগ্যবস্তু লাভেই কোন ক্রমে মনের সুখলাভ হইতে পারে না। ঐশ্বর্য্য সম্পদ লাভে প্রায় সকল লোকেরই আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, তাই বলিয়া উহাই জীবনের প্রকৃত সুখলাভের পন্থা নহে; ওটা আমাদের মনের বিকার মাত্র।

তোমার স্বামী একশত টাকা উপার্জ্জন করেন, তুমি তাহাতে সুখী হইতে পারিতেছ না, ভাবিতেছ পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন করিলে তোমার সুখ হয়। কিন্তু পাঁচ শত টাকা

উপার্জ্জনশীল স্বামীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তিনিও তাহাতে সুখী হইতে পারিতেছেন না। তিনি হাজার টাকার জন্য লালায়িত। আবার দরিদ্রের গৃহিণী তোমার ঐশ্বর্য্যের ঈর্ষ্যা করিতেছেন। জগতে এইভাব বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। কোন দিন যে ইহার ব্যতিক্রম হইবে এরূপ বোধহয় না। খাওয়া বল, পরা বল, অলঙ্কার বল, অট্টালিকা বল, সকলই ত বাঁচার জন্য ? কিন্তু ভোগবিলাসের জন্য ত আর বাঁচা নহে, জীবনের উদ্দেশ্যও তাহা নয়। জীবনধারণ করিতে গেলে যাহা একান্ত দরকার তাহা পাইলেই যথেষ্ট হইল মনে করা উচিত। কারণ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, শাক ভাত খাইয়া দরিদ্রেরা বাঁচে, আবার পোলোয়া কালিয়া খাইয়াও বড় লোকেরা বাঁচে। তাহাতে দুঃখ বা কষ্ট করা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। উহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। বরং ঐশ্বর্য্য বেশী হইলে লোকে সাধারণতঃ তাহাতে উন্মত্ত হইয়া পড়ে ; তাহাতে তাহার ক্ষতি বৈ লাভ হয় না।

জগতে বিদ্যায়, গৌরবে ও মহিমায় যাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দরিদ্রের সন্তান। অর্থহীনতা বা অভাব তাঁহাদের উন্নতির কিছুই ক্ষতি করিতে পারে নাই ; বরং তাঁহাদের মানুষ হইবার পক্ষে সহায়তাই

করিয়াছে। স্নেহময় ভগবান্ সমদর্শী ও তাঁহার করুণা তাঁহার সকল সন্তানের উপর তুল্যরূপে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। দেহ ধারণ করিতে যাহা প্রধান প্রয়োজন তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই।

উদাহরণস্বরূপ দুই একটী কথা বলিতেছি—বাতাস আমাদের প্রাণস্বরূপ, তাহা আমরা সকলেই তুল্যরূপেই পাই। বর্ত্তমান যুগে ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়া না পাইলে আমাদের মন খুঁতখুঁত করে সত্য, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি বসন্তকালের ভগবৎপ্রদত্ত মলয় মারুত অপেক্ষা সে কি বেশী তৃপ্তিকর? নির্ম্মল জল অভাবে আমরা কয়দিন বাঁচিতে পারি? শত সহস্র স্রোতস্বিনীর সুপেয় ক্ষীরধারা কি আমাদের তুল্য ভোগ্য নহে? কল বা ফোয়ারার জল কি এতই সুমিষ্ট? দেহধারণ করিতে হইলে আহার্য্যের প্রয়োজন সন্দেহ নাই; ক্ষীর, সর, নবনী ভোগে ধনীরা যে সুখ লাভ করেন, শাক ভাত খাইয়া দরিদ্রের সে তৃপ্তি হয় না কি? দরিদ্রের দেহ কি সুস্থ থাকে না? নিদ্রা দেহধারণের একটী প্রয়োজনীয় বস্তু ও শ্রেষ্ঠ দৈহিকসুখমধ্যে পরিগণিত। সে সুখ হইতে ভগবান্ ত কোন দরিদ্রকে বঞ্চিত করেন নাই। বরং আত্ম-সন্তোষশীল, ঐশ্বর্য্যচিন্তাহীন দরিদ্রেরাই সে তৃপ্তি পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করে।

অর্থহীনতা ও অর্থপ্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস্তবিকই আমরা বিশেষ কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। কোন অর্থবান্ ব্যক্তি কি জগতের রোগ, শোক, জ্বরা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর হস্ত হইতে অর্থবলে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন? এ যন্ত্রণা দরিদ্রেরও যেমন তাঁহারও তুল্যরূপ। তবে আমরা যে 'হাউ মাউ' করি সেটা যুগধর্ম্ম ও আমাদের মনের ভুল। জটাবল্কলধারী আর্য্যঋষি এবং ভূষণহীনা আর্য্যরমণীগণের স্বচ্ছন্দবনজাত ফলমূল আহারে, কুটিরবাসে বা পত্রশয্যায় শয়নে তাঁহাদের মনের সুখের বা মনুষ্যত্ব লাভের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নাই। আর্য্যযুগ ছাড়িয়া দিলেও, এই সেদিনের কথা, নিষ্ঠাবান্ পরম পণ্ডিত বুনো রমানাথ তাঁহার পুণ্যবতী পত্নীর প্রদত্ত তেঁতুল পাতার ঝোল খাইয়া আনন্দে বলিয়াছিলেন, যাহার বাড়ীতে এমন অমৃত বৃক্ষ এবং যাহার স্ত্রী এমন সুপাচিকা তাহার বাটীতে খাদ্যের অভাব আবার কিরূপে হইতে পারে? মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন উপযোগী ভূমি দান করিবার অভিপ্রায়ে একদিন তাঁহাকে সভায় লইয়া যান, কিন্তু স্বভাবসন্তুষ্টচিত্ত সদানন্দ মহাপুরুষ কোন সাংসারিক অভাবই জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবলমাত্র জীবের আত্যন্তিক দুঃখের বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

সুখ বা আনন্দ লোকের মনে, দ্রব্যে নহে। যদি দ্রব্যে হইত তাহা হইলে সকলেই একই জিনিস বা একপ্রকার জিনিসই ভালবাসিত। তুমি পিঁয়াজের গন্ধে অস্থির হইয়া পড়, আর একজন আনন্দে তাহা আহার করে। সৌন্দর্য্যজ্ঞানী তুমি, যে সুন্দর পুষ্প সাদরে বক্ষে ধারণ কর, অর্থকামী কৃষক অনায়াসে তাহার ক্ষেত্র হইতে সেই পুষ্পবৃক্ষকে আবর্জ্জনার ন্যায় উৎপাটন করে। এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, সৌন্দর্য্য সেই পুষ্পে না তোমার মনে? যদি পুষ্পে হইত সকলেই তাহা তুল্যরূপে ভালবাসিত। সুতরাং যাহা কিছু সুখ এবং যাহা কিছু দুঃখ সবই আমাদের নিজের হাতের গড়া। আমরা ইচ্ছা করিলেই সুখী হইতে পারি, আবার ইচ্ছানুসারেই দুঃখের ভাগী হই। জগতে মঙ্গলময় বিধাতার বিধানে যাহা হইবার তাহা হইবেই, তুমি আমি কেহই রোধ করিতে পারিব না। তাহাতে অসন্তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া 'গেলুম, গেছি' করা আমাদের দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ।

এক ভাবে দেখিতে গেলে জগতে প্রকৃত পক্ষে সকলেই সমান সুখ-দুঃখভাগী। রাজা প্রজা ধনী দরিদ্রে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এজগতে যদি একজন রাজা থাকে ত সকলেই রাজা, আর একজন দরিদ্র থাকিলে সকলেই দরিদ্র। কথাটী একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলা দরকার। মনে কর এক

জন রাজা, এখন দেখ তাঁহার রাজশক্তি ও ঐশ্বর্য্য কি কি? প্রথমতঃ রাজার অনেক প্রজা আছে, অনেক কল্যাণকামী আছেন. তিনি স্বাধীন, তাঁহার আদেশ লোকে দেবাদেশের মত পালন করে, তিনি বরেণ্য সকলে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতা দান করে। মোটামুটি এই লইয়াই তিনি রাজা। এবং সেই সম্মানে সম্মানিত স্বামীর স্ত্রী রাজমহিষী আখ্যা পাইয়া থাকেন।

এখন একজন তোমার আমাব মত সাধারণ লোক লইয়া আলোচনা কর। দেখা যাক্ সাধারণ রাজারাণীর যে যে সম্পদ, যে যে শক্তি আছে. তোমার আমার মত গৃহস্থ রাজারাণীর সে সম্পদ সে শক্তি আছে কি না? পূর্ব্বোক্ত রাজা বা রাজমহিষীর লক্ষ বা কোটী প্রজা বা প্রতিপাল্য; তোমার আমার না হয় দুটী কি পাঁচটী। তিনি যেমন প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা; তুমি আমি কি আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা নহি? একজনও কি আমাদের মুখাপেক্ষী নাই? রাজার সহস্র দাসদাসী সেবারত; তোমার আমার কি একটীও স্নেহপুত্তলিকা পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী, আন্তরিক প্রযত্নে সেবা করে না? রাজার কল্যাণকামনায় লক্ষ প্রজা মঙ্গল-উৎসব করে সত্য; কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি তোমার দরিদ্র স্বামী জীবিকার্জ্জনে যখন বিপদ্‌সঙ্কুল পথে

যান্, তখন তুমি ও তোমার পরিবারস্থ প্রতিপাল্য সকলে আর্ত্তস্বরে কায়মনোবাক্যে কল্যাণ কামনা কর কি না? যদি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ পাত হইয়া যায়, তোমার কি সে দিকে লক্ষ্য থাকে; একমাত্র সেই দরিদ্র স্বামীর মঙ্গল—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল, তাঁহার স্বচ্ছন্দগৃহাগমন তোমার কি ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠে না? জগতে কি এমন কেহ আছে, যাহার জন্য তোমার স্বামী অপেক্ষা মন অধিক চঞ্চল হয়? রাজা রাণী তাঁহাদের রাজত্বমধ্যে স্বাধীন সত্য; তুমি আমি কি আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে পর্ণকুটিরমধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করি না? চিরদুঃখপীড়িতা কাঙ্গালিনী জননীর প্রাণপুত্তলি পুত্রের প্রতি যে স্বর্গীয় স্নেহ, অমৃতময় টান, ঐশ্বর্য্যের প্রভাবে শক্তির শাসনে রাজা কি প্রজার নিকট তদপেক্ষা স্নেহভাজন হইতে সমর্থ হন্? সুতরাং একথা আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, স্বগৃহে স্বজনমধ্যে সকলেই সমান রাজসম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

আমাদের সাধারণ মনঃকষ্ট যে ঈর্ষ্যাসম্ভূত ও মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, আর দুই একটী কথা বলিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তোমার সন্তান যদি কুৎসিত হয়, কৈ তাহাকে ফেলিয়া অন্যের রূপবান্ শিশুকে কোলে লইয়া তুল্য স্নেহেত আদর করিতে পার না? তবে কেন

পরের মূল্যবান্ স্বর্ণবলয় দেখিয়া আপনার দরিদ্র স্বামিদত্ত শাঁখা সিঁদূরে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না? নিজের কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ধারণ না করিয়া, অন্যের সুগঠিত সুঠাম অঙ্গুলিতে পরাইবার জন্য ত পাগল হও না? তবে কেন পরের সুধাধবলিত অট্টালিকা দেখিয়া নিজের পর্ণকুটির পানে দৃষ্টিপাত করিতে তোমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে? ভগবান্ দয়া করিয়া তোমাকে যাহা দিয়াছেন, সেই তোমার মঙ্গল, সেই তোমার বাঞ্ছনীয়, সেই তোমার আদরের। পরের দেখিয়া কেন প্রাণ অস্থির হইবে? যে আনন্দ করে, সে সব তাতে আনন্দ করিতে পারে। যে আনন্দ করে না, তাহার কিছুতেই আনন্দ হয় না। আবশ্যক বোধে যদি দ্রব্যের প্রয়োজন হইত তাহা হইলে বোধ হয় জগতে কোন কষ্ট থাকিত না। সৌন্দর্য্যের জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন। সে সৌন্দর্য্য লাভের জন্য তোমার প্রাণ ব্যাকুল হইতে পারে। তোমার শুধু সেই সৌন্দর্য্য লাভই উদ্দেশ্য হইলে, তুমিও অক্লেশে কাননসুলভ সুমোহন কুসুমে তোমার দেহ আবৃত করিতে পার। বল দেখি, একটী ফুলের যে স্বভাবসৌন্দর্য্য, সহস্র শিল্পী লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে কি সে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে? একটী সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্পমালা বক্ষ ও গ্রীবাদেশ যে শোভায় মণ্ডিত করে, জগতের কোন মূল্যবান্

অলঙ্কার কি তাহা করিতে সমর্থ? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে অলঙ্কার আমাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নহে; উহা আমাদের ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব, এবং সে গর্ব্ব পরশ্রীকাতরতা হইতে উৎপন্ন। পীড়িত ব্যক্তির রোগমুক্তিই উদ্দেশ্য; তাহা যদি তুলসীপাতার রসে সারে, তবে মটরকার করিয়া সাহেব ডাক্তার না আসিলে কি আসে যায়? স্বামীর তৃপ্তিসাধনই তোমার উদ্দেশ্য, তিনি যদি তোমার সযত্নপ্রদত্ত শাকান্নে পরিতুষ্ট হন, তবে স্বর্ণপাত্রে সুবাসিত ভোজ্যের চিন্তায় তোমার অস্থির হইবার প্রয়োজন কি? তবে তাহার জন্য কাঁদিয়া মরা কেন? সংসারধর্ম্ম পালন তোমার নারীজীবনের লক্ষ্য, তাহার সম্পাদনেই তোমার তৃপ্তি। সুখৈশ্বর্য্যসাধন ত তোমার জীবনের ব্রত নহে?

দরিদ্রপীড়িত দেশে শত অভাবের মধ্যে, আমাদের এ সংসারযাত্রা বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে; হিংসা-প্রণোদিত হইয়া সকল বিষয়ে আত্ম-অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করিয়া সংসার-জীবনকে বিষময় করিয়া তোলা কি পুণ্যবতী সতী-স্ত্রীর কর্ত্তব্য? তোমরা যে ইচ্ছা করিলে আত্মসন্তোষ দ্বারা আমাদের শত অভাব, সহস্র অনটনকে অমৃতধারায় মধুময় করিয়া তুলিতে পার। নিজেরাও চিরসুখিনী ও ধন্যা হও। তোমাদের স্বামী ও পরিজনবর্গেরা পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারেন।

একান্নবর্ত্তিতা

হিন্দুদের সংসারজীবনে যতগুলি প্রথা আছে, তাহার মধ্যে একান্নবর্ত্তিতা বা একপরিবারস্থ হইয়া জীবনযাপন-প্রণালী যে কত মধুর, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় একসঙ্গে একযোগে, একচিন্তা এক উদ্দেশ্য লইয়া সংসার করায় যে কত সুখ, কত শান্তি, কত সুবিধা, কত তৃপ্তি তাহা যাহারা উপভোগ করিয়াছে তাহারা কখন পৃথক্ হইবার কল্পনামাত্র মনে আনিতে পারে না। অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে এমন কি একগোত্রস্থ সকল জ্ঞাতি এক সঙ্গে ও একান্নবর্ত্তী হইয়া বাস করিতেন। ইহাতে যে কেবলমাত্র আর্থিক সুবিধা হয় তাহা নহে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় আত্মীয় স্বজনে যে মধুর রক্তের টান, যে পবিত্র প্রীতির সম্বন্ধ যে ভালবাসাবাসি, তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখে। এবং একই চিন্তা ও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী থাকায়, দ্বেষ হিংসা হৃদয়ে স্থান পায় না, পরমানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আজকাল পাশ্চাত্য জাতির সংস্রবে আসিয়া তাহাদিগের স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত সুখ-সম্ভোগের পক্ষপাতী হইয়া আমাদের পূর্ব্বপ্রচলিত এই

পবিত্র প্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে বসিয়াছি। আপনার সুখ, আপনার ছেলেপুলের স্বাচ্ছন্দ্য, আপনার স্ত্রীর ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি লইয়াই আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এই অকিঞ্চিৎকর হেয় সুখলাভের আশায় আমাদের প্রাণের জিনিষ জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছি। আমরা এমনি অন্ধ যে একবার চিন্তা করিয়াও দেখি না কি সামান্য বস্তু লাভের জন্য সংসার জীবনের কি অমূল্যরত্ন বিসর্জ্জন দিতেছি। আপনার সুখ, আমাদের কাছে এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে আমরা স্বচ্ছন্দে মাতা পিতা, সহোদর সহোদরা, আত্মীয় বন্ধু, জ্ঞাতি কুটুম্ব. সকলের প্রীতির বাঁধন হেলায় ছিন্ন করিতেছি। শৈশবে যে কনিষ্ঠ সহোদরকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছি, আহারে বিহারে, ক্রীড়ায় ক্রন্দনে, সুখে দুঃখে, আনন্দে উৎসবে যে আমার একমাত্র প্রাণের সাথী ছিল, আজ তাহারে ঘৃণ্য স্বার্থ ও অর্থের দাস হইয়া দূর করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। শুধু তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হই না, স্বভাবতঃ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সুযোগক্রমে পর হইতেও তাহার সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব বিবাদ, মালি মোকদ্দমা, ঝগড়া ঝাটী আমাদের নিত্য সাথী হইয়া পড়িতেছে। এই একান্নবর্ত্তিতা অভাবে আমাদের চিরপবিত্র প্রীতির আসন রাক্ষসী হিংসা কাড়িয়া লইতেছে।

সুধু প্রীতি নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সামাজিক চক্ষু-লজ্জাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। যে আচরণ অন্যে পরে করিতেও লজ্জিত হয়, আমরা অক্লেশে সে ব্যবহার করিয়া থাকি। আমাদের হৃদয়, আমাদের মন এমনি কঠিন হইয়া যায়, যে অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াও নিরন্ন সহোদরের সাহায্য করা দূরে থাকুক্, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে দ্বিধা বোধ করি না। এই জীবনসঙ্কটের দিনে উক্ত প্রথার উচ্ছেদে আমাদের সামাজিক অবস্থা যে কত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমানে যাঁহারা বা একত্র আছেন তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। একপরিবারস্থ হিন্দু পরিবারের সকল সম্পত্তি ও সকল বস্তুতে সমান দাবী মহর্ষি মনুপ্রবর্ত্তিত পবিত্রবিধির লোপ পাইতে বসিয়াছে। যাঁহারা এক সংসারে থাকেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় দেখিতে পাই, মাত্র আহার একস্থলে হইয়া থাকে, তাহার ভিতরও কোন কোন স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অপর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সকলই স্বতন্ত্র। উপার্জ্জনক্ষম কনিষ্ঠ উপার্জ্জন-হীন জ্যেষ্ঠের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে কুণ্ঠিত নন্। বধূদিগের মধ্যেও ঠিক্ সেই আচরণ। একই সংসারে থাকিয়া একজনের স্ত্রী অষ্ট-অলঙ্কারে ভূষিতা, আর একজনের স্ত্রী জীর্ণবস্ত্র-পরিহিতা। কি বিষদৃশ্য! একজনের কন্যার বিবাহে দশ

হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, আর একজনের কন্যার বিবাহে দুইশত টাকা সংগ্রহ হইতেছে না। একজনের পুত্রেরা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে, আর একজনের পুত্রের পাঠশালার বেতন জুটিতেছে না। সুতরাং এপ্রকার একত্র থাকায় যে পরস্পর কোন প্রীতির বাঁধন থাকিতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মনে হয় পাখী উড়িতে না পারিয়া যেমন পোষ মানে, সেইরূপ উপার্জ্জনহীন ব্যক্তিরাই বাধ্য হইয়া ধনশালিগণের সহিত মিলিত থাকেন। সে তাহাদের সুখের মিলন নহে। অন্নাভাবে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে প্রতিপলে মৃত্যু। কি কারণে দিন দিন একান্নবর্ত্তি প্রথার হ্রাস হইতেছে পরপরিচ্ছেদে তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

গৃহ বিবাদ

একেই স্বভাবতঃ নানাকারণে আমাদের ঘরের বউঝির মন দুর্ব্বল ও স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আমরাও স্বার্থপর হইয়া তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দিতে বিরত থাকি। অধিকন্তু স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের অন্যায় আচরণের

অনেক সময় প্রশ্রয় দিয়াও থাকি। সর্ব্বোপরি পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, ঘরভাঙ্গানীর দল যথেষ্ট সুযোগ পাইতেছে ও তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে।

বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতেছিল, পাড়াদরুন্দী আসিয়া কহিলেন—আহা! বউ মা! অনিল আমার এত টাকা রোজগার করে, আজও তোর গায়ে একখানা গয়না উঠেনি? সরলা বধূ হাসিমুখে উত্তর করিলেন.—কেমন করে হবে ছোট খুড়ী! সংসারের অনেক খরচ তাহাই কুলাইয়া উঠা ভার। "ওমা! তোর আর কিসের খরচ, তোর একটী ছেলে একটী মেয়ে বইতঁ নয়? আর সব টাকাগুলি ত ভূতভুজ্জি হচ্ছে, অনিল আমার একেলে ছেলের মত নয়, তাই সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকির হচ্ছে। কিন্তু বউ মা! পরিণামের ভাবনা ত ভাব্‌তে হয়, সত্তুর মুখে ছাই দিয়ে তোমারও পাঁচটি হতে চল্ল। তাদের মুখের দিকে চাওয়া দরকার। তার উপর লোকের সময় অসময় আছে, শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে, সবদিক্ ভেবেচিন্তে সংসার কর্ত্তে হয়। লোকে কথায় বলে—পরের বিড়াল খায় ও বনপানে চায়। যতই কর না কেন, অসময়ে কিন্তু কেউ থাক্‌বে না। অনিল না হয় আমার বড় ভাল মানুষ কিন্তু তুমি ত মা আমার ছেলেমানুষটী নও, তুমিও কি ছাই কিছু বুঝতে পার না? দেখ বউ মা! তোমাকে বড়

ভালবাসি বলেই এ কথাগুলো বল্লুম, পরে বুঝতে পারবে কিরণ বামণীই ঠিক্ কথা বলেছিল।"

এই যে বিষ সরলা বধূর কাণে ঢালিয়া দিয়া গেল, কালে তাহা অঙ্কুরিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সংসার-কাননটাকে শ্মশানে পরিণত করিল। প্রথমে জায় জায়, ক্রমে ননদিনী শ্বাশুড়ীর সহিত খুঁটিনাটি আরম্ভ হইতে চলিল। সহজে সংসারে থাকিয়া পৃথক হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িলে কেহ বা কিছু-দিনের জন্য পিত্রালয়ে গেলেন, কেহবা সেস্থানে অস্বাস্থ্যের অছিলা করিয়া স্বামীর সহিত তাঁহার কর্ম্মস্থলে বাসের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

সংসারে ঝগড়া বিবাদ প্রথম প্রথম অতি সামান্য কারণ হইতেই সুরু হয়। আজ অমুকের ছেলে অমুককে মারিয়াছে, অমুক অমুকের বই ছিঁড়িয়া দিয়াছে; এই স্বাভাবিক বালকের ঝগড়া লইয়া মায় মায় ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। আমারা দেখিয়াছি, যে সময় উক্তরূপ ঝগড়া লইয়া উভয় মাতা রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন, ঠিক্ সেই সময়েই কলহমান্ শিশু দুটী গলাধরাধরি করিয়া পরমানন্দে পুতুল-খেলায় বিভোর। সুতরাং ইহাকে ঝগড়া কিরূপে বলি। ইহা স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যজনিত পরস্পরের প্রতি হিংসা ছাড়া আর কিছুই নহে।

সাংসারিক কাজকর্ম্ম সকলে কখন সমান করিতে পারে না। কারণ কেহ বা দুর্ব্বল, কেহ বা সবল; কেহ বা কর্ম্মনিপুণা, কেহ বা কর্ম্মকুশলতাহীনা: কাহারও বা পাঁচটী ছেলে মেয়ে, কাহারও বা একটী। সুতরাং তুল্যঅংশে বা তুল্যরূপে সকল কার্য্য সকলের করা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এক্ষেত্রে যদি পরস্পরের প্রতি টান্ থাকে, এবং সেই প্রীতিতে এ উহার সুসার সারিয়া লন, তবেই সংসার নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে। তাহা না হইলে প্রতিপদে ঝগড়া কিচ্‌কিচি আরম্ভ হয়। কাজেই সংসার অশান্তিময় হইয়া পড়ে।

ঝগড়া বিবাদের মূল সূত্র লাগালাগি। সংসারে মানুষ মাত্রেরই অভাব-অভিযোগ ভুল-ভ্রান্তি আছেই। কাহারও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপ্রিয় আচরণে কাহারও মনে যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে ব্যথিত ব্যক্তির স্বভাবই এই যে আত্মীয়ের নিকট মনের দুঃখ বলিয়া কষ্টের লাঘব করা। ইহা সকলেই করিয়া থাকেন। লোকে পরমাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও এরূপ অভিযোগের কথা সময়ে সময়ে পরিচয় করিতে বাধ্য হয়। যে তোমাকে একান্ত আপনার ভাবিয়া তাহার প্রাণের কথাটী বলিল কোন্ প্রাণে তুমি সেই কথাটী অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট লাগাইয়া দেও? এবং লাগাইয়া দিয়াই বা কেমন

করিয়া তাহার নিকট মুখ দেখাও? এ যে ঘোর বিশ্বাস-ঘাতকতা, মহাপাপ। যদি সংসারে এর কথাটী ওরে, ওর কথাটী এরে, লাগালাগি না হয়, তাহা হইলে সংসারের পনের আনা রকমই বিবাদ সংঘটিত হয় না।

তাহার পর উপার্জ্জনের কথা। কাহারও স্বামী হয়ত অধিক উপার্জ্জন করেন, কাহারও স্বামী হয়ত কম উপার্জ্জন করেন, কাজেই সংসার-খরচ প্রথমার স্বামীর অধিক দিতে হয়। তাহাতে যদি তিনি গর্ব্বিতা হয়েন, এবং ঝগড়াঝাটির অছিলায় নির্ম্মম শ্লেষ করেন; কতদিন আর তাহা সহ্য হয়, তাহার সে বিদ্রূপের হাত হইতে এড়াইবার জন্য, সংসার ভাঙ্গিতে হয়। পরিবারস্থ উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি যদি সমদর্শী না হন, তিনি যদি নিজের ও নিজের স্ত্রীপুত্রের স্বতন্ত্র সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও অলঙ্কার ঐশ্বর্য্যের ব্যবস্থা করিতে থাকেন, কাজেই পরিবারস্থ অপর সকলের মনে ব্যথা লাগে এবং স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি ঘৃণা ও হিংসা উপস্থিত হয়; এই সূত্রে প্রতি-নিয়ত ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হয়।

আজ তোমরা একান্নবর্ত্তি পরিবারের সংসারে থাকিয়া পরস্পরের প্রতি যেরূপ আচরণ করিতেছ, ও যে প্রকারে পৃথক্ করিয়া দিতেছ, তাহা ত তোমাদের সন্তানগণের অগোচর থাকিতেছে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারাও সেরূপ

আচরণ না করিবে কেন? এখন ভাবিয়া দেখ দেখি তোমারই উপার্জ্জনশীল পুত্রেরা যদি তোমারই উপার্জ্জনহীন পুত্রকে পৃথক্ করিয়া দেয়, তখন তোমার মনে কিরূপ ব্যথা লাগে? জননী হইয়া, গৃহিণী হইয়া সন্তানের প্রাণে অবহেলায় এ বিষ ঢালিয়া দিও না। ইহাতে তোমরাও জ্বলিয়া মরিবে, সন্তানেরাও জ্বলিয়া মরিবে।

এক্ষণে উক্ত প্রকার কলহ বিবাদ নিবারণের উপায় কি? আমাদের মনে হয় ইহার একমাত্র উপায় তোমাদেরই হাতে। তোমরা যদি আত্মসুখপরায়ণা না হও, তোমরা যদি স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত না হও, তাহা হইলে আমাদের সংসার-জীবনে এ সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে না। তোমরা যদি অন্যান্য জায়ের হাতে তাগাবালা গড়াইয়া দিয়া নিজে তাগাবালা পর তাহা হইলে যে সংসার অমৃতময় হয়। আর্য্যবংশে তোমাদের জন্ম, তোমরা হিন্দুনারী। উর্ম্মিলাদেবী তাঁহার স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর জন্য স্বীয় প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম স্ত্রীজাতির একমাত্র আশ্রয় স্বামী লক্ষ্মণকে তাঁহাদের সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন, আর তোমরা সেই বংশে উদ্ভূতা হইয়া, তোমাদিগের স্বামীর তুচ্ছ উপার্জ্জনের অংশ দিতে পারিবে না? তোমার স্বামী উপার্জ্জন-শীল তাঁহার উপার্জ্জনের অংশ পাঁচজনে উপভোগ করে,

শ্রীবৎস ও চিন্তা

সেকি দুঃখের কথা? নারী-জীবনে ইহাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য।

তোমরা স্নেহময়ী জননী, জগদম্বার অংশভূতা, কেমন করিয়া তোমরা অপরের শিশু সন্তানের উপর "তুই তুই" কর? তোমার দুর্ব্ব্যবহারে যখন সুকুমার শিশু কাতর নয়নে তোমার মুখের দিকে চায়, তখন কি তোমার মাতৃহৃদয়ে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে না? কেমন করিয়া অন্যের শিশুর মুখ বঞ্চিত করিয়া আপন সন্তানের মুখে সুমিষ্ট খাদ্য তুলিয়া দেও? তাহারা যখন ক্ষুব্ধহৃদয়ে নিশ্বাস ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তখন কি তোমার স্নেহভরা বুকখানা ফাটিয়া যায় না? যদি না যায় তোমাকে হিন্দুনারী কেমন করিয়া বলিব? কুন্তীদেবী যে অপরের সন্তানের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য আপনার প্রাণপুত্রকে রাক্ষসের মুখে পাঠাইয়াছিলেন। তোমার জা, তোমার ননদিনী ও সংসারস্থ অন্যান্য পরিজন, যে তোমার ভগ্নীস্বরূপা, তোমার সখীস্বরূপা। কেমন করিয়া চক্ষুলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদের প্রতি রূঢ় বাক্য, অসদাচরণ করিতে পার? আপনার সুখ কি এতই বড়? সামান্য সুখের জন্য এই সকল আত্মীয়ের মনঃপীড়া দিতে কি তোমাদের একটুও বাধে না? এখন যে সামান্য কার্য্যের অছিলা করিয়া তাঁহাদের সহিত ঝগড়া করিতেছ, পৃথক্ হইলে

স্বচ্ছন্দে ত তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতে হইবে। তবে অনর্থক সোনার সংসার ছারেখারে দেও কেন? সংসার করিতে গেলে নানারূপ সুবিধা অসুবিধা, নানা কার্য্যে মতের অমিল হইয়া থাকে সত্য, তাহা না সহ্য করিলে চলিবে কেন? তোমরা যদি একটু ধৈর্য্য ধারণ কর, একটু সহ্য করিতে শেখ, একটু যদি পরের প্রতি স্নেহশীলা হও, তাহা হইলে বোধহয় সাংসারিক বিবাদ বিসম্বাদ সেই মুহূর্ত্তেই শেষ হইয়া যায়। পরস্পর হাসিয়া খেলিয়া পরস্পরকে ভালবাসিয়া সংসার করিলে, সংসার আনন্দে পূর্ণ হয়, ঐশ্বর্য্য উথলিয়া উঠে, সর্ব্ববিধ কল্যাণ হয়, তাহাতে তোমাদেরও জীবন ধন্য এবং তোমাদের স্বামীরও জীবন সার্থক হয়।

অতিথিসেবা ও ধর্ম্মকার্য্য

আমাদের শাস্ত্রে আছে ঃ—

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতিং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥

অর্থাৎ "ভগ্নমনোরথ হইয়া অতিথি যদি গৃহস্থের বাটী হইতে ফিরিয়া যান, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সমুদয় পাপ

গৃহস্থকে দিয়া, গৃহস্থের সমুদয় পুণ্য লইয়া চলিয়া যান্।” অতিথিসেবা—গৃহস্থ মাত্রেরই অবশ্য করণীয়। জগৎপালনই ভগবানের শ্রেষ্ঠ গুণ। অতিথিসেবা সেই জগৎপালনের সহায়তাস্বরূপ। সুতরাং ভগবান্ তাঁহার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত প্রীত হন্। তাহাতে গৃহস্থের সর্ব্বমঙ্গল হয়। এই সেবাধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আর্য্যঋষিরা ভারত পুরাণ প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্মগ্রন্থে ভূয়োভূয়ঃ ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন।

শাস্ত্রে কথিত আছেঃ—স্বয়ং ভগবান্ দরিদ্ররূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান; যে গৃহস্থ দরিদ্রসেবা না করে, দরিদ্রকে আশ্রয় না দেয়, সে ভগবান্‌কে তুচ্ছ করে। ভগবান্‌কে গৃহ হইতে তাড়িত করে। সে গৃহস্থের মঙ্গল কখনই হয় না; হইতে পারে না। ইষ্টদেব বা ইষ্টদেবীর আরাধনা ও পূজা না করিয়া যেমন জল গ্রহণ করিতে নাই, সেইরূপ দরিদ্ররূপী অতিথি-নারায়ণের সেবা না করিয়া গৃহস্থের জল গ্রহণ করিতে নাই। তর্কের খাতিরে অনেকে হয়ত বলিতে পারেন, দরিদ্র সংসারে নিত্য অতিথি-সেবা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আমরা বলিতে চাই, যদি সেই দরিদ্র-সংসারে সন্তানাদি জন্মিয়া আর একটী প্রতিপাল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে কি তাঁহারা সেটীকে উপবাসী রাখেন?

যদি তাহার পালন সম্ভব হয়, তবে একটি গৃহাগত অতিথির সেবা সম্ভব হইবে না কেন? দুঃখের বিষয়, আজকাল ক্রমশঃই আমাদের দেশ হইতে এই সৎপ্রবৃত্তি লোপ পাইতে বসিয়াছে। ফলে, দেশে দিন দিন অনাহারক্লিষ্ট দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সকল গৃহস্থ যদি সমভাবে সাধ্যানুরূপ দরিদ্র-সেবার ভার গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় দেশের এতাধিক দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু এই সৎপ্রবৃত্তি লোপের জন্য প্রধানতঃ দায়ী কে? আমরা বলি আমাদের গৃহিণীরা। কারণ দেশকাল অনুসারে পুরুষেরা জীবিকার্জ্জনে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, এসব সৎকার্য্য সম্পাদনের অবসর তাঁহারা খুব কম পান্। অনেকক্ষেত্রে আবার অবসর পাইলেও দরিদ্রতা নিবন্ধন প্রতিনিবৃত্ত হন। কিন্তু সেবা-পরায়ণা গৃহিণীর পক্ষে এসব সৎকার্য্য সাধনের অবসরও যথেষ্ট সুযোগও আছে। যদি তাঁহাদের স্বামী এ বিষয়ে আপত্তি করেন, তাঁহারা সহজেই মিষ্টব্যবহারে তাঁহাদিগের মতি পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। তাঁহাদের সহস্র আব্দার যদি স্বামীরা সহাস্যে বহন করিতে সমর্থ হন, তবে এ শুভ আব্দারটী যে সহজেই তাঁহারা সহ্য করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। গৃহস্থ অবশ্য পাঁচজনের জন্যই রন্ধনের আয়োজন করেন। তাহা হইতে যদি একজনের খাদ্য বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়,

তাহা হইলেও বোধ হয় পরিজনবর্গের বিশেষ অসুবিধা বা কষ্ট হয় না।

ক্ষুধিতের মুখে অন্নদান যে কি পুণ্য, কি তৃপ্তি, যাঁহারা সে অন্নদান করেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারেন। আশ্রয়হীন, সহায়হীন দরিদ্র উদরের জ্বালায় কাতর হইয়া তোমার দ্বারে আসিল, তুমি তাড়াইয়া দিলে তাহাকে সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হইবে। সে যে কি যন্ত্রণা তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে কেহ কি তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে? তোমরা প্রসূতি—সন্তানের জননী। দরিদ্র তোমার সন্তানস্বরূপ। পুরুষেরা যা করে করুক; তুমি কোন্ প্রাণে সন্তানের সে অনাহার-ক্লেশ দেখিবে? অবশ্য এমন হইতেছে না যে, নিত্য দলে দলে তোমার দ্বারে অতিথি আসিতেছে। যেদিন আসিল, সেদিন সন্তানের জন্য না হয় একটু কষ্টই করিলে। সমস্ত জগতের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য আমরা বলিতেছি না। সাধ্য পক্ষে একজনেরও ক্ষুধাত নিবৃত্তি করিতে পার। পুণ্যবতী দাতাকর্ণের স্ত্রী, তিনি ত তোমাদেরই জননী। তোমরা ত তাঁহারই অংশভূতা, তিনি যে এক দিন অতিথি-সেবার জন্য স্বহস্তে প্রাণপুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। এ গৌরব, এ মহিমা কি তোমাদের প্রাণে জাগে না? তাহা যদি না জাগে, তবে আর্য্য-

বংশে জন্মাইয়াছ কেন? তোমরা হিন্দুনারী, ধর্ম্মই তোমাদের সার সর্ব্বস্ব, পুণ্যই তোমাদের চির প্রহরী। অতিথি-সেবাবিমুখা শকুন্তলার দুর্দ্দশা কি তোমাদের মনে নাই? অতিথিকে অবমাননা করিয়া তাঁহাকে যে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। নারী জীবনে যার বাড়া দুঃখ আর নাই, সে দুঃখও যে তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। অতিথিসেবার জন্য তোমাদের আদি জননী আর্য্যদেবীরা যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন। আর তোমরা কি তন্নিমিত্ত সামান্য কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না?

তোমরা সহধর্ম্মিণী, তোমাদের সহযোগে ও সহায়তায় পুরুষের ধর্ম্মজীবন পূর্ণ হয়। কঠোর কর্ম্মশীল পুরুষের জীবনে তোমরাই শান্তিময়ী স্নেহধারা। তোমরা যদি ধর্ম্মপরায়ণা না হও, স্বামীর জীবনে শান্তিরসের সুধাধারা কেমন করিয়া প্রবাহিত হইবে? তোমরাই ত ব্রতপরায়ণা হইয়া স্বামীকে সংযমী করিয়া তুলিবে। তোমরাই ত ভক্তিমতী হইয়া স্বামীকে সেবাপরায়ণ করিয়া তুলিবে। সংসারের যত কাঠিন্য, যত কঠোরতা তোমার স্বামীর স্কন্ধে ন্যস্ত; আর পৃথিবীর পূর্ণ কোমলতা স্নেহ-মমতা সে ত তোমাদিগকেই আশ্রয় করিয়া আছে। তোমরা যদি স্বগুণবর্জ্জিতা হও, তাহা হইলে যে সংসারে দানবীয় তাণ্ডব নৃত্য চলিবে। আমাদের

ধর্ম্মের সংসার যে ছারখার হইয়া যাইবে। একপক্ষে পুরুষ যেমন তোমাদিগকে জগতের সমুদয় বিঘ্ন, সমুদয় বিপদ্, সমুদয় বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন; অন্য পক্ষে তোমরাও যে তাঁহাদিগকে সমুদয় নির্ম্মমতা, সমুদয় কঠোরতা, সমুদয় নৃশংসতা হইতে প্রেমের বন্ধনে ফিরাইয়া রাখিবে। এই ত স্ত্রী-পুরুষের পবিত্র সম্বন্ধ। একের অভাবে যে অন্যের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী, ইহা ত তোমরা বুঝিতে পার। পুরুষ কর্ম্ম; তোমরা ধর্ম্ম। পুরুষের সমুদয় কর্ম্মজীবনকে তোমাদের পবিত্র ধর্ম্মালোকে চির উজ্জ্বল করিয়া তোলা তোমাদের কর্ত্তব্য। ধর্ম্মহীন কর্ম্ম হইলে সে ত বিনাশের হেতু-স্বরূপ হয়। যাহা লইয়া আর্য্যনারীর মহত্ব, যাহা লইয়া আর্য্য-নারীর গৌরব, যাহা লইয়া আর্য্যনারীর অস্তিত্ব, আর্য্যনারী হইয়া বিলাস-স্রোতে সেই চির পবিত্র ধর্ম্মব্রত ভাসাইয়া দিয়া পিশাচিনী সাজিও না।

সতীত্ব ও সহমরণ

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

যে রমণী স্বামীর দুঃখে দুঃখিতা, স্বামীর সুখে সুখিনী,

স্বামী প্রবাসী হইলে মলিনা ও কৃশাঙ্গী হন, এবং যিনি স্বামীর মরণে সহমৃতা হন, শাস্ত্রে তাঁহাকে পতিব্রতা রমণী কহে।

উপরোক্ত শাস্ত্রবচন আলোচনা করিলে বুঝা যায়, সুখে দুঃখে হর্ষে বিষাদে পত্নী যখন পতির সহিত সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া যান্, তাঁহার সকল অস্তিত্ব যখন স্বামীতে বিলীন হইয়া যায়,তখন যথার্থ তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সাধিত হইল। পতির সহিত এই একত্ব, অর্থাৎ তাঁহার সকল কার্য্যে পূর্ণভাবে মিলিয়া যাওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নহে; বিশেষ সাধনসাপেক্ষ। সেইজন্যই কুমারীকাল হইতে সে বিষয়ের শিক্ষা ও সাধনার আবশ্যক।

পরমারাধ্যা শঙ্করপত্নী সতী সতীত্বের আদর্শস্বরূপ ইহাই আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার সেই পুণ্যময় চরিত্র হইতে সতীত্বের উৎপত্তি। কুমারীগণ এই কারণেই জ্ঞানোদয়ের পর হইতে সতীর আদর্শ লক্ষ্য করিয়া শিবপূজানিরতা হয়েন; এবং এই কারণেই কুমারীকালে শিবপূজা শাস্ত্রের বিধান। আজকাল কুমারীগণের এই ব্রত লোকাচারে পরিণত হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম, ইহার উদ্দেশ্য, ইহার মহত্ত্ব কয়জন অভিভাবক, বালিকাদিগকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করেন? উদ্দেশ্য-হীন কার্য্যের ফল যেমন অকিঞ্চিৎকর, বর্ত্তমান শিবপূজার

ফলও সেইরূপ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে বসিয়াছে। শিব-পূজার সঙ্গে সঙ্গে কুমারীরা যাহাতে সতী চরিত্র আলোচনা ও উপলব্ধি করে, প্রত্যেক অভিভাবকেরই সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এই পুণ্যব্রত সতীত্ব লাভের সোপানস্বরূপ। ইহাতে একাধারে পুণ্য, পবিত্রতা, দেবভক্তি ও চরিত্র লাভ হয়।

বর্ত্তমানকালে হিন্দুসমাজে যেরূপ বিবাহসমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ক্ষেত্রবিশেষে কুমারীচরিত্রে সতীত্ববিরোধী রেখাপাত হইয়া থাকে। বিবাহ এখন কেনা-বেচার রূপান্তর। যৌতুকের মূল্য হিসাবে পাত্র নির্ব্বাচিত হয় এবং সে নির্ব্বাচনপ্রথাও একান্ত অভদ্রোচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ গুণ, চরিত্র, বংশমর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইতেছে। আশানুরূপ অর্থ পাইলে সকল ত্রুটী সারিয়া যায়। বিবাহক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিচার্য্য বিষয় কন্যার রূপ। সভামধ্যে সঙ্কুচিতা, শঙ্কিতা পুরকুমারীকে লইয়া গিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব, চলনভঙ্গী, বচনচাতুর্য্য পরীক্ষা করা হয়। ভাগ্যক্রমে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তবে বিবাহ সিদ্ধ হইবে; নচেৎ সহস্রগুণের অধিকারিণী হইয়াও সে কুমারীর বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। আবার পাত্র গিয়া স্বয়ং কন্যা দেখিয়া আসার প্রথা বিরল নহে।

কুমারী জানিল ইনি আমার ভাবী স্বামী ; তাঁহার হয়ত মনে মনে পছন্দ হইল, কিন্তু অর্থ অস্বাচ্ছল্যেই হউক বা পাত্রের অনভিমতেই হউক বিবাহ হইল না। ইহাতে কি কুমারীর পাতিব্রত্যের উপর আঘাত করা হইল না ?

শিক্ষিত আমরা, ভদ্র আমরা, সভ্য আমরা, ঘরের একটী কুমারী কন্যা লইয়া সাধারণ সমক্ষে এরূপভাবে পরীক্ষা ও আলোচনা করিতে কি লজ্জা করে না ? পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, পরিচিত অপরিচিতের সাক্ষাতে এরূপভাবে রূপ সম্বন্ধে পরীক্ষিত হওয়া বয়স্থা কুমারীর পক্ষে যে কি সঙ্কোচ, তাহা কি আমরা একবার ভাবিয়া দেখিবারও অবসর পাই না ? এবং এই ব্যবহারে নারীর রূপই যে একমাত্র বস্তু ইহা কি আমরা তাহাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিই না ? তৃতীয়তঃ হয়ত কন্যা পছন্দ হইল, পাকা দেখা শুনাও হইয়া গেল, কন্যা আত্মীয় স্বজনের নিকট পাত্রের গুণ-রূপাদির বিষয় ভূয়োভূয়ঃ শ্রবণ করিল ; বয়োধর্ম্মে কুমারী মনে মনে তাহাকে পতীত্বে বরণ করিল ; তাঁহার চিন্তায় তাঁহার ধ্যানে কিছুকাল অতিবাহিত হইল ; হঠাৎ দেনা পাওনা লইয়া কি বিসম্বাদ হইল, বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। এমন কি বিবাহ-সভা হইতে পাত্র উঠিয়া গেল। কুমারীর পবিত্র পাতিব্রত্য লইয়া এরূপ ধূলাখেলা করিতে আর্য্যসন্তানের লজ্জা করে

না?—ইহাই আশ্চর্য্য। কুমারী অবস্থায় যে কোন পুরুষকে একবার মনে মনে চিন্তা করিয়া পুরুষান্তর গ্রহণ করিলে কুমারী যে পতিতা হয়েন, হিন্দু হইয়া একথা কি আমরা জানি না? সাবিত্রী, দময়ন্তীর দৃষ্টান্ত কি একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? আমাদের কর্ত্তব্য বিবাহ স্থির সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বে কোনরূপে পাত্র সম্বন্ধীয় কোন কথা কুমারীর কর্ণগোচর হইতে না দেওয়া এবং যাহাতে এই বাজার-যাচাই প্রথা উঠিয়া গিয়া কুমারীগণের সম্মান রক্ষা হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

এ ত গেল সমাজের কথা। এক্ষণে নারীগণের সতীত্ব-ধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে তুই একটী কথা আলোচনা করিব। স্বয়ং ভগবান্ স্বামীরূপ ধারণ করিয়া সাধ্বী রমণীগণের সেবা গ্রহণ করেন, ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। সুতরাং স্বামী ভগবানের স্বরূপ এ বিষয়ে সংশয় নাই। স্ত্রী-জীবনে স্বামিসেবাই একমাত্র মুক্তির পথ। স্ত্রীলোকের স্বামী ছাড়া ধর্ম্ম নাই, স্বামিসেবা বৈ কর্ম্ম নাই, স্বামিচিন্তা ব্যতীত ধ্যান নাই। সেই জন্যই আমাদের সুবিজ্ঞ শাস্ত্রকারেরা স্বামীর সমক্ষে দেবতা এমন কি গুরুদেবকে প্রণামও স্ত্রীজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বামীসেবা শুধু কর্ত্তব্য নহে, ইহা জীবনের সার সর্ব্বস্ব। যে হতভাগিনী সে সুখে

বঞ্চিতা তাহার মত দুর্ভাগ্যবতী আর কে আছে? সাধ্বী রমণীরা কস্মিন্‌কালে স্বামীর কোন কথার প্রতিবাদ করিবেন না। স্বামীর ব্যবহার সুখপ্রদ হউক বা কষ্টকর হউক, সানন্দচিত্তে সহ্য করিবেন। স্বামীর গুণাগুণ সম্বন্ধে কখনও আলোচনা করিবেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করা সাধ্বী রমণীর কর্ত্তব্য নহে। কেবল মাত্র দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করিলেই সতী হওয়া যায় না। কায়মনোবাক্যে একান্তে স্বামিপরায়ণা হইতে হইবে। ভ্রমক্রমেও যেন কুচিন্তা মনে না আসে।

একজাতীয়া সাধ্বী রমণী আছেন যাঁহারা জগতে স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও পুরুষ বলিয়া চিন্তা করেন না। আর একজাতীয়া রমণী আছেন যাঁহারা স্বামী ভিন্ন অন্য সকলকেই সন্তান স্থানীয় দেখেন। সতীত্ব রক্ষা করিতে হইলে উপরোক্ত দুইটি মতই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে হয়। অপর পুরুষকে ঐ ভাবে ভাবিলে এবং সে চিন্তা হৃদয়ে দৃঢ় হইলে পুরুষ সম্বন্ধীয় কোন কুচিন্তাই আর মনে স্থান পায় না, বা সামাজিক হিসাবে কোন হাস্য পরিহাসও চলিতে পারে না। সতীচরিত্রের উজ্জ্বল আদর্শ আমরা স্থানান্তরে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি। সেই সমুদয় পুণ্যময় কাহিনী পাঠে সাধ্বী পাঠিকারা সবিশেষ ফল লাভ করিতে পারিবেন আমাদের বিশ্বাস।

"সাধ্বীগণের চরম গতি সহমরণ। পূর্ব্বকালে তাঁহারা সানন্দচিত্তে মৃতস্বামীর চিতারোহণ করিতেন, সে কি মহিমময় দৃশ্য। সুস্থ দেহে, প্রফুল্ল অন্তঃকরণে, বধূবেশে সজ্জিতা হইয়া, দুর্ব্বার অগ্নিশিখাকে তুচ্ছ করিয়া সহাস্যমুখে স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে স্বদেহ উৎসর্গ করা, আর্য্যনারীর কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিই ছিল। এ পুণ্যময় অনুষ্ঠান, এ পবিত্র দৃশ্য, এ চির উজ্জ্বল সতীত্ব দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলেই আত্মা পবিত্র হয়। কিন্তু কালে যখন সে অন্তিম ব্রত প্রথায় পরিণত হইল, অনিচ্ছা সত্ত্বে অভিভাবকেরা যখন লোকনিন্দা-ভয়ে বলপূর্ব্বক নারীদেহ দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তখনই ইংরাজেরা সে প্রথা উচ্ছেদ করিতে বাধ্য হইলেন। তদবধি মৃত স্বামীর সহিত চিতারোহণ বন্ধ হইয়াছে সত্য; কিন্তু সহমরণ উঠিয়া যায় নাই। বৈধব্যের পর সাধ্বী রমণীরা যে ভাবে জীবন যাপন করেন, তাহা মৃত্যু ছাড়া আর কি? অশন-বসন, বিলাস-বিভ্রম, লালসা-কামনা, ভোগ-বাসনা, দৈহিক ও মানসিক সুখের পূর্ণ লুপ্তির নামই ত মৃত্যু। জীবিতের যা কিছু শক্তি থাকে, সে শক্তিও তাঁহারা স্বামীর সন্তানের ও পরিজনবর্গের সেবায় নিতান্ত নিষ্কামভাবে নিয়োগ করিয়া থাকেন। ব্রত উপবাসাদিতে দেহ শুষ্ক করিয়া উপবাসদিনে স্বামিচিন্তায় অতিবাহিত করেন। সহমরণ

অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষাময় সংসারে বাস করিয়া, এ পবিত্র সন্ন্যাস-ব্রত পালন করা বোধহয় আরও কঠিন, আরও শ্লাঘ্য, আরও পূজার্হ। সাধ্বী বিধবার পুণ্যময়ী সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না ভক্তিবিগলিত হয়? হিন্দু-জাতির এ পতিত দিনে যদি কোন গৌরব থাকে, তবে সে তাহাদের সাধ্বী স্ত্রী ব্রতপরায়ণা পবিত্রহৃদয়া আত্মত্যাগিনী বিধবা।

ভারতের নারী

(দ্বিতীয় ভাগ)

সতী-কথা

সতী

সতীত্বের পূর্ণাবতার 'সতী' ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যা। শৈশব হইতে অত্যন্ত সংযমী হইয়া সাধনা করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন। পাগলভোলা শ্মশানে-মশানে ফিরেন, ছাইভস্ম মাখেন, আপনার ধ্যানে সদাই বিভোর। রাজার নন্দিনী সতী তাঁহারই মত পাগলিনী সাজিয়া, সেই পাগল-ভোলার সেবা করিয়া ধন্য হন। জগতের ঐশ্বর্য্য উভয়ের নিকট সমানই তুচ্ছ।

কিছুদিন পরে দেবতাদের এক যজ্ঞ হইল, তাহাতে সমস্ত দেবতাই উপস্থিত হইলেন। বড় বড় দেবতার মধ্যে অনেকেই দক্ষের জামাতা। দক্ষ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইবামাত্রই সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। করিলেন না কেবল পিতা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু। সতীর প্রেমে ভোলা পরমযোগী মহাদেব ছাইভস্ম মাখিয়া, সিদ্ধিপানে বিভোর হইয়া সভার একপার্শ্বে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসিয়াছিলেন। সম্মান পাইবার আশায় দক্ষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কেবলমাত্র দক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অন্য দেবতার মত, জামাতার মত, কোনরূপ সম্মান দেখাইলেন না। ইহাতে দাম্ভিক দক্ষ নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া মহাদেবের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন ও এইরূপ ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে অজস্র গালি দিলেন। আশুতোষের কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, দক্ষের এই তিরস্কারে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

দক্ষ এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি স্বয়ং এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সমস্ত দেবতাদের নিমন্ত্রণ করিলেন কেবল করিলেন না তাঁহার অপমানকারী কনিষ্ঠ জামাতা দেবাদিদেব মহাদেবকে। মনে ভাবিলেন ইহাতে তাঁহাকে বিলক্ষণ অপমান করা হইল। পিতা ব্রহ্মার নিত্য-পূজ্য, জগতের সংহার-কর্ত্তা মহাদেবের প্রতিহিংসায় আজ তিনি অন্ধ। তিনি প্রকৃতই অন্ধ, তিনি না বুঝিয়া নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিলেন।

দক্ষযজ্ঞে একে একে সমস্ত দেবতাই আসিলেন। দক্ষের অন্যান্য কন্যারা সকলেই আসিলেন। বাকি রহিলেন কেবল সতী। সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই, কেননা তিনি মহাদেবের পত্নী।

নিমন্ত্রণের ভার নারদের উপর পড়িয়াছিল। তিনি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া শেষে কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। সতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "তোমার পিতা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কেবল তোমাদেরই হইবে না"। নারদ চলিয়া গেলেন।

সতী মহাসমস্যায় পড়িলেন। একদিকে জন্মদাতা পিতা, অন্যদিকে তাঁহার একমাত্র আরাধ্যদেবতা স্বামী। যদিও সতী স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন কোন কর্ম্মই করিবেন না, তথাপি তিনি স্থির জানেন 'শিব' তাঁহার স্বামী, আশুতোষ কখনই তাঁহার পিতার এই অপমান গ্রহণ করিবেন না। আর তাঁহার পিতা শিবনিন্দা করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ টানিয়া আনিতেছেন, এক্ষণে যদি তাঁহাকে বুঝাইয়া শিবের প্রতি বিদ্বেষভাব ত্যাগ করাইতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয় কন্যার উপযুক্ত কার্য্য করা হইবে এই ভাবিয়া তিনি এই অপমান সত্ত্বেও পিতৃগৃহে

যাইবার জন্য স্বামীর আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভগ্নীরা সকলে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি একান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন ও করযোড়ে ভোলানাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রেমের সাগর ভোলানাথ সতীর মনোবাসনা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না। নন্দী মাতাকে লইয়া দক্ষালয়ে চলিল।

সতীর মাতা সতীকে পাইয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, সতীও অনেকদিন পরে মাকে দেখিয়া আনন্দিতা হইলেন। সতীর অন্যান্য ভগ্নীদের বড় বড় দেবতাদের সহিত বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের বেশভূষার সীমা নাই। সতীকে নিরাভরণা দেখিয়া সকলে উপহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সতীর মত হতভাগিনী আর নাই, এক ভিখারীর হাতে পড়িয়া সতীর কোন সাধই মিটিল না"। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না যে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সেই সতীর ও তাঁহার ভিখারী স্বামীরই সৃষ্ট, তাঁহারা ঐশ্বর্য্য সকলকে দেন, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যে স্পৃহা হইবে কেন?

সতী যজ্ঞসভা দেখিতে চলিলেন। পিতাকে যথারীতি সম্মান দেখাইয়া তিনি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দক্ষ সতীকে দেখিবামাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ও মহাদেবের উদ্দেশে যথেষ্ট কটূক্তি করিলেন। বিনা নিমন্ত্রণে আসিবার জন্য সতীকেও বিলক্ষণ অপমানিতা হইতে হইল। পিতার এই দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া সতী পিতাকে যথেষ্ট বুঝাইলেন। বলিলেন "আমার স্বামী আপনার কোন অনিষ্টই করেন নাই। বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়াছি আমি, আপনি আমাকেই তিরস্কার করুন। স্বামী স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা, আমার সম্মুখে

আপনি তাঁহার নিন্দা করিবেন না”। সতীর কথায় দক্ষ আরও অধিক রাগান্বিত হইলেন এবং শিবকে আরও অধিক দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন। সতী অস্থির হইলেন, দক্ষের দুর্ব্বাক্যস্রোত অধিকতর বেগে চলিতে লাগিল; সতী কম্পিতা হইলেন, স্বামীনিন্দা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ভোলানাথের অভয়পদ ভাবিতে ভাবিতে সতী দেহত্যাগ করিলেন, দক্ষ তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না।

নন্দী নিকটেই ছিল। মায়ের দেহত্যাগে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উন্মত্তের মত কৈলাসে ছুটিয়া গিয়া মহাদেবের নিকট সব বলিল। সর্ব্বদর্শী মহাদেবের কিছুই অগোচর ছিল না, সতীশোকে তিনি অধীর হইলেন। উন্মত্তের মত হা সতি! হা সতি! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তে সংহারমূর্ত্তি ধরিলেন। সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, দেবতারা প্রমাদ গণিলেন। মস্তকের একগাছি জটা ছিঁড়িয়া মাটীতে আঘাত করিলেন। সহসা সংহারমূর্ত্তি বীরভদ্রের সৃষ্টি হইল। বীরভদ্র তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের দিকে ছুটিলেন, অনুচরেরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। মুহূর্ত্তে যজ্ঞসভা লণ্ডভণ্ড হইল, যে যেদিতে পারিল পলাইল, অনেকের দুর্দ্দশার সীমা থাকিল না। শিবহীন যজ্ঞ এইরূপে শেষ হইল।

মহাদেব উন্মাদের মত যজ্ঞস্থলে আসিয়া দেখিলেন তাঁহারই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়া ছিন্ন লতার মত ভূতলে পড়িয়া আছেন। তিনি সেই শবদেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং উন্মাদের মত শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, জগতের কোন চিন্তাই আর তাঁহাতে স্থান পাইল না।

পার্ব্বতী

মহাদেব সতীর শব স্কন্ধে লইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সংহারকর্ত্তা সংহারকার্য্য ভুলিয়া, জগতের চিন্তা ভুলিয়া আজ সতীশোকে উন্মাদ। দেবতারা বড় চিন্তিত হইলেন। সকলে মিলিয়া ভগবান বিষ্ণুর নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। বিষ্ণু দেখিলেন সতীর শব তাঁহার নিকট হইতে পৃথক্ করিতে না পারিলে আর কোনও উপায় নাই, সুতরাং অলক্ষ্যে সুদর্শনচক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ৫২ অংশে বিভক্ত হইয়া দেহখানি ৫২ স্থানে পড়িল। প্রত্যেক স্থান মহাপীঠস্থানে পরিণত হইয়াই সেই পর্য্যন্ত সকলের পূজিত হইয়া আসিতেছে।

মহাদেব যখন বুঝিতে পারিলেন যে সতীর দেহ আর স্কন্ধের উপর নাই, তখন তিনি আরও অধীর হইলেন, তাঁহার আরও অধিক বৈরাগ্যভাব আসিল। শ্মশানে শ্মশানে আর ভ্রমণ না করিয়া, তিনি হিমালয়ের এক প্রদেশে মহা তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। স্বয়ং তপস্যার ফলদাতা, নিজেরই অগ্নিমূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশ করিয়া তাহাতে আহুতি দিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বসিদ্ধিযুক্ত, কে জানে আজ তাঁর কিসের কামনা! বুঝি পুনরায় সতীলাভের জন্যই এই তপস্যা।

পর্ব্বতরাজ হিমালয় ও তাঁহার সাধ্বী-স্ত্রী মেনকার অনেকগুলি সন্তান। মৈনাক তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ। তিনি ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লাভ করেন। রাজদম্পতী বহুকাল হইতেই ভগবতীকে কন্যারূপে

লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন.—সুতরাং তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ও প্রেমের সাগর ভোলানাথের প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সতী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।

শুভদিনে শুভক্ষণে, বহুদিনের আরাধ্যধন, ভোলানাথের তপস্যার ফল, সতী ভূমিষ্ঠ হইলেন। আকাশ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। শশিকলার মত দিন দিন তিনি বাড়িতে লাগিলেন। সৌন্দর্য্য শরীরে আর ধরে না, তাঁহার মুখের তুলনা নাই, তাঁহার চরণের তুলনা নাই. তাঁহার গতির তুলনা নাই, পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বুঝি একস্থানে জমিয়া আছে। চরণভঙ্গে স্থলপদ্ম ফুটিয়া উঠিত, নূপুরনিক্কণে কলহংস লজ্জা পাইত। আদর করিয়া কেহ ডাকিত পার্ব্বতী, কেহ ডাকিত গৌরী, কেহ ডাকিত উমা। সখীদের সঙ্গে পুতুলখেলায় পার্ব্বতীর কতই আনন্দ। মাটীর শিবই তাঁর পুতুল। কখনও সেই মাটীর শিব লইয়া খেলা করিতেন, কখনও তাহার পূজা করিতেন, কখনও তাহার বিবাহ দিতেন। এই পুতুল খেলায় তিনি সব ভুলিয়া যাইতেন।

ক্রমে ক্রমে পার্ব্বতী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন, সৌন্দর্য্য যেন উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বজন্মের বিদ্যা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক আগ্রহের সহিত পার্ব্বতী মাটীর শিব পূজা করিতে লাগিলেন। কন্যার এইরূপ গুণ শিবপূজায় এই আসক্তি দেখিয়া মহাদেবকে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া হিমালয় তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু পাছে তিনি অস্বীকার করেন এজন্য তিনি মহাদেবের কোন অনুমতি চাহিতে সাহসী হইলেন না।

একদিন নারদ আসিয়া বলিয়া গেলেন যে মহাদেবের সহিতই তাঁহার পার্ব্বতীর বিবাহ নিশ্চিত। হিমালয় কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। সঙ্গীদের সঙ্গে পার্ব্বতী তপস্যানিরত স্বয়ং মহাদেবের নিকট যাইতেন, তিনিও তাঁহার পূজা গ্রহণ করিতেন। মেনকা প্রথম প্রথম বারণ করিতেন, কিন্তু নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি তিনি ও হিমালয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পার্ব্বতীকে শিবপূজার জন্য পাঠাইয়া দিতেন, উদ্দেশ্য পার্ব্বতীর রূপ দেখিয়া যদি মহাদেব মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব করেন। যাহা হউক, পার্ব্বতী এখন হইতে প্রত্যহ সখীদের সঙ্গে শিবপূজা করিতে যাইতেন। এখন আর মাটীর পুতুল নহে স্বয়ং শিবই তাঁহার উপাস্য দেবতা।

এদিকে দেবতারা তারকাসুরের উৎপাতে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সকলেই নিজের নিজের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মার বরে সে অসুর অজেয়, কেহ তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলেন না। এক দিন সকলে মিলিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের দুঃখের কাহিনী বলিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন "একমাত্র শিবের পুত্রই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে, অন্যথা কোন উপায় নাই। শিব এখন মহাধ্যানে নিমগ্ন, যদি গিরিরাজ-কন্যা পার্ব্বতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিকার সম্ভব।" দেবতারা এখন সকলে মিলিয়া মদনকে হিমালয়ে পাঠাইলেন,—আশা মদনই শিবের ধ্যানভঙ্গ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন।

একদিন পার্ব্বতী যথারীতি শিবপূজায় আগমন করিয়াছেন। মদনও

অবসর বুঝিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সঙ্গে বসন্তও আসিয়াছে। বসন্তের আগমনে হিমালয় নূতনশ্রী ধরিল, মদন মোহন বেশে উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় রহিলেন। পার্ব্বতী মহাদেবের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পদ্মবীজের মালা তাঁহার হস্তে দিয়েছেন, ভক্তবৎসল মহাদেবও তাহা গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন এমন সময় মদন ফুলধনুকে সম্মোহন নামক শর যোজনা করিলেন। মহাযোগী ক্ষণিক বিচলিত হইয়া পার্ব্বতীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন, পরে আত্মদমন করিয়া নিজের চিত্তবিকৃতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখেন সম্মুখে মদন। অমনি তৃতীয়নেত্র ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, অগ্নিজ্বালা সবেগে ছুটিল, মুহূর্ত্তে মদন ভস্মীভূত হইল। দেবতারা আকাশে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। অবিলম্বে সেস্থান ত্যাগ করিয়া মহাদেব চলিয়া গেলেন, পার্ব্বতী ক্ষুণ্নমনে গৃহে ফিরিলেন।

পার্ব্বতী এখন বুঝিলেন রূপে প্রেম সম্ভবে না। বিনা সংযমে বিনা সাধনায়, বিনা তপস্যায় প্রেম মিলে না; তাই এখন হইতে তিনি মহা তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। বসনভূষণ ত্যাগ করিয়া তিনি বল্কল ও চিরবসন ধারণ করিলেন। অনাহার, অনিদ্রা কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। শীতে আকণ্ঠ শীতল জলে দাঁড়াইয়া, দারুণ গ্রীষ্মে ভীষণ অগ্নি চারিপার্শ্বে বেষ্টন করিয়া যোগিনী যোগ করিতে লাগিলেন। মুখে শুধু শিবনাম, হৃদয়ে শুধু অভীষ্ট দেবতা হৃদয়দেবতার অভয়পদ চিন্তা; এইরূপে কত কাল গেল হিমালয় হতাশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সোণার পার্ব্বতীর এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তবৎসল ভোলানাথ

এই তপস্যায় ভক্তের নিকট না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। একদিন ছদ্মবেশে পার্ব্বতীর নিকট আসিয়া দেখা দিলেন। কথাপ্রসঙ্গে শিবকে পাইবার জন্য তিনি তপস্যা করিতেছেন, জানিতে পারিয়া, তিনি পার্ব্বতীর ভক্তি পরীক্ষার জন্য কৃত্রিম বিদ্রূপের সহিত শিবের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন, এবং "শিব সমস্ত দেবতার মধ্যে নিকৃষ্ট, তাঁহার সহিত বিবাহ হইলে যথেষ্ট দুঃখভোগ করিতে হইবে, অন্য দেবতার সহিত বিবাহ হইলে বিলক্ষণ সুখভোগের সম্ভাবনা" ইত্যাদি বলিয়া পার্ব্বতীকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী এই শিবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন। মুহূর্ত্তে ছদ্মবেশ অন্তর্হিত হইল, তাঁহার উপাস্য দেবতা, তাঁহার হৃদয়-দেবতা সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শিব পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। পার্ব্বতীর তপস্যা শেষ হইল।

হিমালয় ও মেনকা এই সংবাদে যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন, এবং সত্বরই বিবাহের আয়োজন করিলেন। হিমালয় স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিলেন। দেবতারা মহানন্দে মহোৎসবে যোগদান করিলেন। ভোলানাথ তাঁহার হারাণ সতী পাইলেন।

সাবিত্রী

অতি পূর্ব্বকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার কোন সন্তানাদি হয় না। অবশেষে সাবিত্রীদেবীর উপাসনা করিয়া এক কন্যা লাভ করিলেন, নাম রাখিলেন 'সাবিত্রী'।

সাবিত্রীর বরে জন্মগ্রহন করিয়া 'সাবিত্রী' দেবতার রূপ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সাবিত্রী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। রূপের প্রভায় যেন দিগন্ত আলোকিত হইল। কন্যাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া অশ্বপতি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সাবিত্রীর উপযুক্ত পতি মিলিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অশ্বপতি কন্যাকে স্বয়ং পতি অনুসন্ধানে অনুরোধ করিলেন। পিতার আদেশে সাবিত্রী স্বয়ং পতি অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া সাবিত্রী অবশেষে এক তপোবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। শাল্বদেশের অন্ধরাজা দ্যুমৎসেন স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পত্নী সুবর্চ্চা ও পুত্র সত্যবান্‌কে লইয়া সেই তপোবনে বাস করিতে ছিলেন। শুভমূহুর্ত্তে সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের সাক্ষাৎ হইল। সাবিত্রী সেই মূহুর্ত্তে তাঁহাকে মনে মনে স্বামীরূপে বরণ করিলেন। সিদ্ধ মনোরথ হইয়া সাবিত্রী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন মহর্ষি নারদ অশ্বপতির সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, এমন সময় সাবিত্রী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন ও "তপোবনবাসী সত্যবান্ তাঁহার স্বামী" এই কথা পিতাকে বলিলেন। নারদ এ বিবাহে অসম্মতি জানাইয়া কহিলেন—"সত্যবান্ অল্পায়ুঃ, অদ্য হইতে সম্বৎসরে তাহার মৃত্যু নিশ্চিত।" অশ্বপতিও সাবিত্রীকে অন্য কোন পাত্র মনোনীত করিতে বলিলেন। সাবিত্রী কহিলেন—"আমি মনে মনে সত্যবান্‌কেই স্বামীরূপে বরণ করিয়াছি, পুনরায় অপরকে কিরূপে বিবাহ করিব? সত্যবান্ অল্পায়ু হইলেও, তিনিই আমার স্বামী।" কন্যার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া অশ্বপতি বাধ্য হইয়া সেই

তপোবনে দ্যুমৎসেনের নিকট গমন করিলেন এবং শুভক্ষণে সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। সাবিত্রী তপোবনেই রহিলেন।

নারদের বাক্য সাবিত্রীর মনে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক আছে। তিনি সর্ব্বক্ষণই সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনের ৩ দিন পূর্ব্বে তিনি স্বামীর মঙ্গলকামনায় ত্রিরাত্রব্রত করিলেন। অবশেষে সেই ভীষণ দিন উপস্থিত হইল।

সত্যবান্ যথারীতি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জন্ম বনে চলিলেন। সাবিত্রী সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, সত্যবান্ অনেক নিষেধ করিলেন কিন্তু সাবিত্রী কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। অগত্যা সত্যবান্ তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। স্বাধ্বী স্বামীকে যেন গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া চলিলেন।

কাষ্ঠ কাটিতে কাটিতে সত্যবানের অত্যন্ত শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। তিনি নিতান্ত অস্থির হইয়া সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন। সত্যবানের চেতনা লোপ হইল। ভীষণ রাত্রি উপস্থিত হইল। বনের অন্ধকার রাত্রির অন্ধকারকে যেন আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে এক দেবজ্যোতিঃ বিকাশ পাইল। সাবিত্রী চাহিয়া দেখেন—হস্তে দণ্ড, মস্তকে কিরীট, অঙ্গে জ্যোতিঃপুঞ্জ এক বিরাট্ মূর্ত্তি! সাবিত্রী প্রণাম করিলেন। দেবতা কহিতে লাগিলেন—"মা সাবিত্রি! আমি ধর্ম্মরাজ যম, তোমার স্বামীর পরমায়ু শেষ হইয়াছে। আমার অনুচরেরা তোমার সতীত্বতেজে অগ্রসর হইতে পারিল না, আমি স্বয়ং আসিয়াছি; তোমার স্বামীকে ত্যাগ করিয়া তুমি গৃহে গমন কর। মর্ত্ত্যবাসী সকল জীবের অদৃষ্টে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে সেজন্য দুঃখ করা উচিত নয়," এই বলিয়া মৃত্যুরাজ

সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক পুরুষমূর্ত্তি বাহির করিয়া চলিতে লাগিলেন। সাবিত্রী তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন "পিতঃ, আপনি যেমন বলিলেন মৃত্যুই বিধির বিধান, আবার সেই বিধির বিধানেই নারী স্বামীর অনুসরণ করিতে বাধ্য। অতএব আপনি আমাকে নিবারণ করিতেছেন কেন?" ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার ধর্ম্মজ্ঞানে পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি। স্বামীর পুনর্জ্জীবন ব্যতীত অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী কহিলেন —"আমার অন্ধ শ্বশুর চক্ষুলাভ করুন।" যমরাজ কহিলেন—"তথাস্তু"। আবার কিছুদূর গিয়া যম পশ্চাৎ ফিরিয়া সাবিত্রীকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন—"বৎসে! তোমার স্বামীর আয়ুঃশেষ হইয়াছে, তুমি গৃহে গমন কর, তোমার উপর আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, পতি ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী বর প্রার্থনা করিলেন—"আমার শ্বশুর হৃতরাজ্য উদ্ধার করুন।" যম উত্তর করিতে "তথাস্তু"। সাবিত্রী পুনরায় চলিতে লাগিলেন, যম কহিলেন—"অনর্থক কেন আসিতেছ? গৃহে যাও।" সাবিত্রী বলিলেন—"আমি যাইতেছি না, কে যেন আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সেখানে স্বামী থাকিবে সেইখানেই স্ত্রী থাকিবে। আমার আত্মা ত' পূর্ব্বেই গিয়াছে, এখন দেহ যাইতেছে।" আবার যমরাজ বলিলেন,—"স্বামীর জীবন ভিন্ন অন্য কোন বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী বলিলেন—"আমার পিতার পুত্র হউক। যমরাজ "তথাস্তু" বলিয়া চলিতে লাগিলেন। সাবিত্রীকে আবার পশ্চাতে দেখিয়া যমরাজ বলিলেন—"মা তুমি বড় অবোধের ন্যায় কাজ করিতেছ। স্বামী পাপাচরণ করিয়া নরকে যাইলে স্ত্রীরও কি সেখানে যাইতে হইবে?"

সাবিত্রী বলিলেন—"ধর্ম্মরাজ! নিশ্চয় যাইব। স্বামী জীবিতই হউন, মৃতই হউন স্ত্রীলোক স্বামীর পূজা করিবে। স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্বামীর ইহকাল পরকালের সম্পর্ক। স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্মের সহায়, কর্ম্মের সঙ্গিনী। অতএব স্ত্রীলোক স্বামীর পাপে নরকে যাইতেও প্রস্তুত হইবে কিন্তু পৃথক্ ভাবে স্বর্গে যাইতেও চাহিবে না।" ধর্ম্মরাজ বলিলেন "তোমার ধর্ম্মজ্ঞানে আমি কতদূর সন্তুষ্ট তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু কি করিব? আয়ু শেষ হইলে কেহ তাহাকে বাঁচাইতে পারে না। অতএব তুমি স্বামীর জীবন ভিন্ন সব বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী বলিলেন "পিতঃ, যখন এত অনুগ্রহ করিলেন তখন সত্যবানের পুত্র রাজা হইবে এই বর দিন।" যমরাজ সাবিত্রীর কথায় এত তন্ময় হইয়াছিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন "তথাস্তু"। সাবিত্রী আশ্বস্তা হইলেন, স্বামীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন বুঝিলেন। পুনরায় যমরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। যম এবার বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"তোমার প্রার্থিত সমস্ত বরই দান করিয়াছি, আর কি তোমার প্রার্থনা করিবার আছে? তোমার স্বামীর কাল শেষ হইয়াছে, এক্ষণে কোন উপায় নাই, তুমি গৃহে গমন কর"। সাবিত্রী কহিলেন—"ধর্ম্মরাজ, এইমাত্র আপনি বলিয়াছেন যে সত্যবানের পুত্র রাজা হইবে। তিনি মৃত! ইহা কিরূপে সম্ভবে? আপনার বাক্য কি অন্যথা হইবে?" ধর্ম্মরাজ চিন্তিত হইলেন, বুঝিলেন বালিকার নিকট তিনি পরাস্ত হইয়াছেন। সন্তুষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তিনি সত্যবান্‌কে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। সাবিত্রী সত্যবানকে লইয়া হৃষ্টচিত্তে ফিরিয়া আসিলেন। সত্যবান্ যেন নিদ্রা হইতে উঠিলেন, তিনি এপর্য্যন্ত কোন সংবাদই জানেন না।

রাত্রি হইয়াছে, অথচ সাবিত্রী তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করেন নাই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন। পরে সাবিত্রীর মুখে তাঁহার মহানিদ্রার কথা ও তাঁহার চেষ্টায় পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন শুনিয়া ধন্য হইলেন।

সত্যবান্ ও সাবিত্রীকে বহুক্ষণ দর্শন না করিয়া অন্ধ রাজা ও তাঁহার পত্নী বড়ই শোকাকুল হইলেন। সহসা অন্ধের নয়ন উন্মীলিত হইল, উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সত্যবান্ ও সাবিত্রী হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কুটীরে আগমন করিলেন। তাঁহাদের নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়া সাধ্বী স্ত্রী সাবিত্রীকে সহস্রবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। ধর্ম্মরাজের বরে ক্রমে দ্যুমৎসেন রাজ্যলাভ করিলেন, অপুত্রক পিতার শতপুত্র হইল। সাবিত্রীও পুত্রের জননী হইয়া রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। সাধ্বী-স্ত্রী স্বামীর জন্য যমের নিকটে যাইতেও ভীত হন না।

সীতা

যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু পবিত্র, তাহা সীতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বংসহা সীতার মত হওয়া সব স্ত্রীলোকের উদ্দেশ্য। এই সীতা মিথিলার রাজা রাজর্ষি জনকের কন্যা। প্রবাদ আছে :— ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে গিয়া জনক রাজা এক রূপলাবণ্যবতী কন্যা প্রাপ্ত হন। সেই কন্যাকে তিনি নিজের কন্যার ন্যায় লালনপালন করেন। লাঙ্গলের ফলা হইতে উঠিয়াছিলেন বলিয়া সেই কন্যা সীতা নামে অভিহিতা হন।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সীতার রূপ উছলিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার গুণেরও সীমা রহিল না। পিতার নিকট হইতে সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বধর্ম্ম শিক্ষা করিলেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ছয় বৎসর।

রাজর্ষি জনক কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে দান করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার গৃহে বহু সাধনায় প্রাপ্ত হরধনু ছিল, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে কেহ সেই ধনু ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন। একে একে সকল দেশের রাজকুমারগণ আসিলেন, কিন্তু ধনু ভঙ্গ করা দূরে থাক, অনেকেই তাহা তুলিতেই পারিলেন না। লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণও আসিয়াছিলেন, তিনিও অসমর্থ হইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে লঙ্কায় ফিরিলেন। জনক মহা চিন্তিত হইলেন।

তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাতে বিশ্বামিত্র ঋষি, অযোধ্যার রাজা দশরথের নিকট হইতে রাম ও লক্ষ্মণকে তাড়কা-বধের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। তাড়কা-বধের পর রামকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া বিশ্বামিত্র সেই দুই ভাইকে লইয়া জনকের সভায় উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম অবলীলাক্রমে সেই ধনু ভঙ্গ করিলেন। রামের সহিত সীতার বিবাহ হইল। দশরথ সংবাদ পাইয়া মিথিলায় আসিয়াছিলেন। জনকের তিন ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত রামের অপর তিন ভ্রাতার বিবাহ হইল। সীতা অযোধ্যায় আসিলেন।

অযোধ্যায় গিয়া সকলের কয়েক বৎসর বেশ সুখে কাটিল। দশরথ অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ায় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী নিজ পুত্র ভরতকে রাজা করিবার

উদ্দেশ্যে কৌশলে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস ঘটাইলেন। রামের বনগমনই স্থির হইল।

রাম একে একে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শেষে জানকীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কহিলেন—"জানকি! মনে করিয়াছিলাম বুঝি আমাদের চিরদিন এইরূপ সুখে কাটিবে, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য আমি বনবাসী হইতে চলিয়াছি। তুমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর গুরুজন সেবায় নিযুক্ত থাকিও। আমায় বিদায় দাও।" এই কথায় সীতা কহিলেন—"তুমি যদি বনগমন কর তাহা হইলে আমি কি সুখে রাজপ্রাসাদে থাকিব? তুমিই আমার একমাত্র দেবতা, তুমিই আমার একমাত্র গুরু; তুমি যখন যে ভাবে থাকিবে আমিও সেই ভাবে থাকিব। তোমার মুখেইত শুনিয়াছি, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের অন্য গতি নাই। তুমিই তো বলিতে স্বামীর জীবনে স্ত্রী জীবিত থাকে, স্বামীর সুখে স্ত্রী সুখ ভোগ করে। তুমি যদি বনে যাও, আমি দাসী হইয়া সঙ্গে যাইব। দাসীর সেবায় তোমার অনেক কষ্টের লাঘব হইবে।" রাম অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন, বনবাসের ক্লেশের কথা বিস্তৃতরূপে বুঝাইলেন। সীতা উত্তর করিলেন —"তোমার সঙ্গে তরুতলে বাস করিলেও আমি তাহা স্বর্গ বলিয়া মনে করিব; তোমার সঙ্গে থাকিয়া ধূলি ধূসরিত হইলে তাহা চন্দনশোভিত বলিয়া মনে করিব, কুশকণ্টকে শরীর বিদ্ধ হইলে আমি তাহা তোমার স্নেহ-চুম্বন বলিয়া মনে করিব। তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিব।" সীতার এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া রাম তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যা

অন্ধকার করিয়া বনে চলিলেন। পুত্রশোকে দশরথের দেহত্যাগ হইল।

অনেক বন ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা অবশেষে পঞ্চবটী বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে রাক্ষসদের বড়ই উৎপাত। লঙ্কার রাজা রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা একদিন রাম-লক্ষণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করে। ইহাতে তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট অপমানিত হইয়া ভ্রাতার নিকট গিয়া নিজের দুঃখের কথা বলে। রাবণ শূর্পণখার মুখে সীতার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে হরণ করিবার জন্য মারীচ নামে এক রাক্ষসকে পাঠাইয়া দেন, নিজেও সঙ্গে আসেন। মারীচ স্বর্ণমৃগচ্ছলে রামকে কুটীরের অনেক দূরে লইয়া যায়। মারীচের কৌশলে লক্ষ্মণকেও কুটীর ত্যাগ করিতে হইল। সীতাকে অসহায় পাইয়া রাবণ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া সীতা-হরণ করেন। সীতা এইরূপে রাম হইতে পৃথক্ হইলেন। সীতা লঙ্কায় রাবণের বন্দিনী রূপে থাকিতে বাধ্য হইলেন। রামের বিরহে সীতা মৃতপ্রায় হইলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ বহু কষ্টে সীতার সন্ধান পাইয়া সুগ্রীব ও হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণের সহিত বন্ধুত্ব করিলেন। হনুমান্ একলাফে সাগর পার হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইয়া সন্ধান করিয়া জানিলেন সীতা অশোকবনে চেড়ীগণবেষ্টিত হইয়া আছেন। সেই চেড়ীগণ অন্য কাজে যাইলে হনুমান্ সীতার কাছে গিয়া বলিলেন—"দেবি! আপনার স্বামী বহু কষ্টে আপনার সন্ধান পাইয়া আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এবং আপনি এখানে আছেন নিশ্চয় জানিলে তিনি সসৈন্যে লঙ্কা

আক্রমণ করিয়া আপনার উদ্ধার করিবেন।” সীতার মলিন বেশ ও ম্লান মুখ দেখিয়া হনুমান্ বলিলেন “মা! যদি কষ্ট একেবারে' অসহ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আমি এক লাফে সাগর পার হইয়া আপনাকে শ্রীরামের নিকট গিয়া দিব।” সীতা যদিও হনুমানের নিকট নিদর্শন পাইয়াছিলেন যে হনুমান রামের ভক্ত ও চর, তথাপি পরপুরুষের স্কন্ধে উঠিয়া রক্ষা পাওয়া এবং চোরের মত বীরশ্রেষ্ঠ হরধনুর্ভঙ্গকারী রামভার্য্যাকে লইয়া গেলে তাঁহার স্বামীর অগৌরব হইবে ভাবিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। বাধ্য হইয়া হনুমান্ ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বানরগণের সাহায্যে সাগরে সেতু বাঁধিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিয়া রাবণ ও তাঁহার সৈন্যগণকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিলেন।

এতকাল পরগৃহে বাস করিয়াছেন বলিয়া পাছে প্রজারা কোন কলঙ্ক আরোপ করে এই ভয়ে রাম সীতার অগ্নি-পরীক্ষা করাইলেন। সাধ্বী সীতা নীরবে অনুমোদন করিলেন। সকলে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

কৈকেয়ীর পুত্র ভরত বহু অনুরোধেও রাজসিংহাসনে বসেন নাই। রামের আজ্ঞা লইয়া তাঁহার পাদুকা সিংহাসনে রাখিয়া নিজে প্রজা-পালন করিতে ছিলেন, এখন রামকে পাইয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। অযোধ্যাপুরী আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইল। কিন্তু তখনও সীতার দুঃখের অবসান হইল না। অগ্নিপরীক্ষা প্রজারা কেহ চক্ষে দেখে নাই, সুতরাং তাহা বিশ্বাস না করিয়া অনেকে সীতার উপর মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া রাম সীতার

পুনরায় বনবাসের ব্যবস্থা করিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া কৌশলে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিলেন।

সীতার দুঃখের সীমা রহিল না। সীতা তখন পূর্ণগর্ভা। রাজরাণী মুনির কুটিরে যমজপুত্র প্রসব করিলেন। রাজকুমারদিগের জন্ম কেহই জানিল না। বাল্মীকি যথাকালে তাহাদের জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার করাইয়া সর্ব্বশাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করাইলেন। এই সময় বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া লব-কুশকে শিক্ষা দিলেন। লব-কুশের মুখে বাল্মীকির রচিত রামায়ণ গান শুনিয়া সীতা অনেক দুঃখ কষ্ট ভুলিতেন।

মহা সমারোহে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে আছে কোন কাজই স্ত্রী ভিন্ন সম্পন্ন হয় না, তাই সীতার স্বর্ণমূর্ত্তি যজ্ঞের জন্য গড়াইতে হইয়াছিল। সমস্ত রাজা ও মুনিদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বাল্মীকি লব-কুশকে সঙ্গে লইয়া সেই যজ্ঞে আসিয়া লব-কুশকে দিয়া রামায়ণ গান করাইলেন। সকলেই লব-কুশের গানে মুগ্ধ হইলেন। রামের সীতা-স্মৃতি জাগরূক হওয়ায় তিনি অস্থির হইলেন। বাল্মীকি সীতাকে আনিয়া রামকে দিলেন। সীতার মনে স্বামীর প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব ছিল না। কেবলমাত্র প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্যই যে তাঁহার স্বামী এরূপ কার্য্য করিয়াছেন তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। স্বামীর প্রতি ভক্তি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। বাল্মীকি সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য রামকে অনুরোধ করিলেন। পুনরায় পরীক্ষার কথা উঠিল। পরীক্ষার কথা শুনিয়া সীতার নিজের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল, তিনি "ভগবতি বসুন্ধরে দ্বিধা হও" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। সহসা সভাস্থল দ্বিখণ্ড হইল। পাতাল হইতে এক

দেবীমূর্ত্তি উঠিয়া সীতাকে লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সীতা পৃথিবী হইতে উঠিয়াছিলেন, আবার পৃথিবীতেই লীন হইলেন।

শৈব্যা

ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশে হরিশ্চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। শৈব্যা তাঁহার মহিষী। বহুদিন রাজপ্রণয় উপভোগ করিয়া শৈব্যা এক পুত্র লাভ করেন, নাম রোহিতাশ্ব। শৈব্যার সুখের সীমা রহিল না।

কিন্তু সুখের দিন চিরকাল থাকে না, শৈব্যারও থাকিল না। হরিশ্চন্দ্র একদিন মৃগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একস্থানে রমণীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন এক ঋষি ত্রিবিদ্যা সাধন করিতেছেন। ত্রিবিদ্যা ঐরূপ আর্ত্তনাদ করিতেছেন। হরিশ্চন্দ্র উহাতে ব্যথিত হইয়া ঋষিকে ঐ জঘন্য পৈশাচিক কার্য্যের জন্য বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। কিন্তু সেই ঋষি অপর কেহ নহেন রাজর্ষি বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, পরে অনেক অনুনয় করায় তিনি শান্ত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র আত্মপরিচয় দিলে তিনি কহিলেন "তোর কর্ত্তব্য বুদ্ধি কি ?" রাজা উত্তর করিলেন দান।" বিশ্বামিত্র কহিলেন—"আমাকে কি দান করিবি ?" রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী দান করিলেন। এবং

দানের উপযুক্ত দক্ষিণা সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রাও দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু রাজকোষ পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন সুতরাং অর্থ কোথায় পাইবেন? অধিকন্তু বিশ্বামিত্র তাঁহাকে তাঁহার প্রদত্ত পৃথিবীর মধ্যেও বাস করিতে দিলেন না। হরিশ্চন্দ্র তিনদিনের ভিতর দক্ষিণা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। বারাণসী পৃথিবীর বাহিরে সুতরাং তাঁহার বারাণসী গমনই স্থির হইল।

রাজমহিষী শৈব্যা, যিনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীশ্বরের পত্নী, আজ ভিখারিণীর বেশে প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইলেন। রাজকুমার রোহিতাশ্ব আজ ভিখারী। বসন-ভূষণে পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার নাই, কেননা সমস্তই বিশ্বামিত্রকে দান করিয়াছেন।

দক্ষিণাদানের শেষ দিন উপস্থিত। সহস্র স্বুবর্ণমুদ্রা দান করিতে হইবে, অথচ ভিখারী হরিশ্চন্দ্রের হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই! হরিশ্চন্দ্র একমনে ধর্ম্মকে, ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন— হে ধর্ম্মরাজ! যেন অধর্ম্মে পতিত না হই।

ধর্ম্মরাজ সদয় হইলেন। সে সময়ে দাসদাসী বিক্রয়প্রথা প্রচলিত ছিল। বারাণসীর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শৈব্যাকে দাসীরূপে ৫০০৲ স্বুবর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্বয়ং এক চণ্ডালের নিকট ৫০০৲ স্বর্ণ মুদ্রায় বিক্রীত হইলেন। বিশ্বামিত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দক্ষিণা পাইলেন; হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্ম রক্ষা হইল। রোহিতাশ্ব মাতার সহিত থাকিল। রাজনন্দিনী শৈব্যা এক্ষণে ক্রীতদাসী। যে দেহ একদিন নিত্য নব বসন-ভূষণে আচ্ছাদিত হইত, রাজভোগে পরিপুষ্ট হইত, তাহা এক্ষণে ছিন্ন মলিন বস্ত্রে অর্দ্ধ আবৃত হইতে লাগিল, অনাহারে অর্দ্ধাহারে

সে দেহ শুষ্ক হইতে লাগিল। তাঁহার প্রভুর প্রদত্ত মুষ্টিমেয় অন্নের অধিকাংশই রোহিতাশ্বকে দিয়া নিজে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। সে ব্রাহ্মণ শৈব্যাকে ক্রয় করিয়াছেন, রোহিতাশ্বকে ক্রয় করেন নাই, সুতরাং রোহিতাশ্বকে খাইতে দিতেন না। রাজার সন্তান, কাঙ্গালের ধন রোহিতকে লইয়া তিনি স্বামিশোক সহ্য করিতে লাগিলেন। স্বামীর এই অযথা দান ও দক্ষিণায় তাঁহার বিন্দুমাত্র বিরক্তি ভাব আসিত না, বরং স্বামীর যে ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে এই চিন্তাতে তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন।

কিন্তু এখনও দুঃখের শেষ আসিল না। রোহিতাশ্ব একদিন বাগানে ফুল তুলিতে গিয়াছে, এমন সময় সর্পাঘাত হইল। দেখিতে দেখিতে শৈব্যার নয়নমণি, বিপদের অবলম্বন শৈব্যার ক্রোড়েই নিভিয়া গেল। অনাথিনী শৈব্যাকে নিজেই পুত্রের শবদেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে লইয়া যাইতে হইল।

চণ্ডাল, হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিয়া তাঁহাকে শ্মশানে শবদেহ সৎকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। মহারাজ হরিচন্দ্র রাজধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, প্রজাপালন ত্যাগ করিয়া, শবের সৎকারে নিয়োজিত হইলেন। শবদাহ-কারীদিগের নিকট হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক গ্রহণ, তাহাদিগের শবদাহ কার্য্যে সহায়তা, ইহাই এক্ষণে তাঁহার নিত্যব্রত।

রাত্রি ভীষণ অন্ধকারময়ী। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া রাত্রির ভীষণতাকে যেন আরও বাড়াইতেছে। প্রকৃতির সেই ভীষণতার মধ্যে চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্র তাঁহার প্রভুর কার্য্য করিবার জন্য শ্মশানে গমন করিতেছেন। অদূরে বামা-কণ্ঠের করুণ

ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া অগ্রসর হইয়া দেখেন এক নারী একটী মৃত বালক ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতেছে। নারী আর কেহই নহেন—শৈব্যা, রোহিতকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন—"আমার প্রাপ্য রাখিয়া তুমি চলিয়া যাও, আমি তোমার পুত্রের সৎকার করিব।" শৈব্যা কহিলেন—"আমার এক কপর্দ্দকও দিবার ক্ষমতা নাই, আমার স্বামী জীবিত, আমি এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসী।" স্বামী জীবিত! স্ত্রী ব্রাহ্মণের ক্রীতদাসী শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র বিচলিত হইয়া কহিলেন—"ইহার পিতা কি নিষ্ঠুর! পুত্র মৃত, স্ত্রী উন্মাদিনী, সে এখানে এখনও উন্মাদ হয়ে ছুটে এসে পড়েনি?" চণ্ডালের মুখে পতিনিন্দা শুনিয়া শৈব্যা বিচলিত হইয়া বলিলেন—"চণ্ডালরাজ! আপনি এস্থানে আমার একমাত্র বন্ধু। আপনি বন্ধু হইয়া আমার স্বামীর নিন্দা করিতেছেন কেন? জানেন কি—স্ত্রীলোকের স্বামী কত বড়? স্ত্রীলোকের ইহকাল পরকাল যে স্বামী, তাঁহার নিন্দা স্ত্রীলোকের কাছে করা উচিত নয়। মা সতী, স্বামিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এসব আপনারা বোধহয় জানেন না? স্ত্রীলোকেরা সেই সতীর অংশ হইতে জন্মিয়াছে, অতএব তাহারা স্বামিনিন্দা শুনিলে স্থির থাকিবে কিরূপে? আর আমার স্বামী একমাত্র ধর্ম্মের জন্য এরূপ অবস্থায় আমাদের রাখিয়াছেন।" পরে তাঁহার ক্রন্দনে প্রকাশ পাইল যে পুত্রের নাম রোহিতাশ্ব, স্বামীর নাম হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন। জগতে আরও হরিশ্চন্দ্র আছে? আরও রোহিতাশ্ব আছে?—হরিশ্চন্দ্র বড়ই অস্থির হইলেন; মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎ চমকিত হইল! সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইল। সেই আলোকে হরিশ্চন্দ্র দেখিলেন যে

তাঁহারই পত্নী শৈব্যা তাঁহারই একমাত্র বক্ষের ধন রোহিতাশ্বকে লইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। সেই মৃত্যুবিবর্ণ দেহের উপর হরিশ্চন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন. মূর্চ্ছা ভঙ্গে সেই আকুল বিলাপের মধ্যে তিনি সমস্ত অবগত হইয়া শোকে জ্ঞানহারা হইয়া ভাগিরথিগর্ভে ঝম্পপ্রদানে উদ্যত হইলেন; কিন্তু প্রভু চণ্ডালের আদেশ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। এই ভীষণ স্থানে, ভীষণ সময়ে বিশ্বামিত্র সহসা উপস্থিত হইলেন এবং তপঃপ্রভাবে রোহিতাশ্বকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। রাজর্ষির আশীর্ব্বাদ লইয়া হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যহারে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবী প্রত্যার্পণ করিলেন। শৈব্যার দুঃখের রজনী পোহাইল।

দময়ন্তী

বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তীর রূপগুণের তুলনা নাই। মাতা পিতার একমাত্র কন্যা, রাজ্যৈশ্বর্য্যের মধ্যে দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দময়ন্তী যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন, অঙ্গের রূপ উছলিয়া উঠিল। রাজা কন্যার স্বয়ংবর ঘোষণা করিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন দময়ন্তী অন্তঃপুরমধ্যে এক উপবনে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক সুন্দর রাজহংস তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৌতূহল-পরবশ হইয়া দয়মন্তী হংসটীকে ধরিলেন। ধৃত

হইয়া হংস, দময়ন্তীকে বলিল "রাজকুমারি! আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে নলের সংবাদ বলিব।" ইতিপূর্ব্বে দময়ন্তী অনেকবার নলের কথা শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজহংসের মুখে নলের প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। হংস দময়ন্তীর নিকট নলের রূপ, গুণ, তাঁর প্রতি নলের আসক্তি ইত্যাদি সব কথাই বলিল। দময়ন্তী মনে মনে নলকে আত্মসমর্পণ করিলেন। হংস স্বস্থানে চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে স্বয়ংবরের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। এক এক করিয়া রাজারা উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নলও সংবাদ পাইয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও কলির সহিত নলের সাক্ষাৎ হইল। শুনিলেন তাঁহারাও দময়ন্তীকে লাভ করিবার জন্য বিদর্ভে যাইতেছেন। নলকে দেখিয়া দেবতারা তাঁহাকে দময়ন্তীর নিকট দূতস্বরূপ পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। নল স্বীকৃত হইলেন। বিবাহার্থী দেবতাদের দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট নলরাজ চলিলেন। নল ভিন্ন এ কার্য্য আর কাহার দ্বারা সম্ভব? দেবতাদের অনুগ্রহে নল অলক্ষ্যে চলিলেন।

আজ স্বয়ংবরের দিন। দময়ন্তী উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া স্বয়ং বরসভায় যাইবার জন্য নিজ শয়নকক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় এক দিব্য পুরুষমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাঁহার শয়ন-কক্ষে অকস্মাৎ এরূপ পুরুষের আগমনে দময়ন্তী আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। পুরুষমূর্ত্তি কহিতে লাগিল—"রাজকুমারি! আমি দেবতাদের দূত। ইন্দ্র, চন্দ্র, প্রভৃতি দেবতারা আপনার পাণিগ্রহণমানসে আমাকে দূত

করিয়া পাঠাইয়াছেন।" দময়ন্তী প্রণাম করিয়া নিষ্কম্পভাবে উত্তর করিলেন—"দূত! দেবতারা আমার পূজনীয়, তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, আমি পূর্ব্বেই একজনকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছি। এক্ষণে, দেবতাই হউন বা যে কেহই হউন, অপর কাহাকেও বরণ করিলে আমি নিশ্চয়ই সতীধর্ম্ম হইতে বিচ্যুতা হইব। দেবতারা ধর্ম্মের রক্ষক, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি যাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি তাঁহাকেই যেন লাভ করিতে পারি।" দেবদূত উত্তর করিলেন—"কে তোমার অভীষ্ট স্বামী?" দময়ন্তী উত্তর করিলেন—"নিষধরাজ নলই আমার স্বামী।" দেবদূত সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—"আমিই নিষধরাজ নল।" মুহূর্ত্তে দেবদূত অদৃশ্য হইলেন। দময়ন্তী স্তম্ভিতা হইলেন।

স্বয়ংবর সভায় একে একে সকল রাজাকে অতিক্রম করিয়া দময়ন্তী অবশেষে নলের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু একি বিপদ্! নলের ন্যায় আরও চারিজন নল পার্শ্বে বসিয়া আছেন! সতী কাহাকে মাল্যদান করিবেন? দময়ন্তী বুঝিলেন নিশ্চয়ই এ দেবতাদের ছলনা। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—হে দেবতাবৃন্দ! হে ধর্ম্মরক্ষক! আমাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন। সতীধর্ম্মের অপেক্ষা আর কোন ধর্ম্ম অধিক উচ্চ। আজ আমায় সেই সতীধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখুন। সতী মুহূর্ত্তে দেখিলেন যে আকারেইঙ্গিতে চারিজন অপর হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন, তাঁহাদের চক্ষে নিমেষ নাই, শরীরে ঘর্ম্ম নাই, তাঁহারা ভূমিস্পর্শ করেন নাই। সতী প্রকৃত নলকে চিনিতে পারিলেন। শঙ্খরোলের মধ্যে পুষ্পমাল্যের সহিত দময়ন্তী নলকে হৃদয়দান করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

নিষধে দময়ন্তীর দিন সুখে কাটিতে লাগিল। কিন্তু সে সুখ বহুকালস্থায়ী হইল না। নলের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম পুষ্কর। নলের এ সুখ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। দুরাত্মা পাশাক্রীড়ায় নলের অপেক্ষা অধিক পারদর্শী ছিল। সে এক্ষণে নলকে পাশাক্রীড়ায় আহ্বান করিল। এ ক্রীড়ায় নলেরও আসক্তি যথেষ্ট ছিল। কলির প্রভাবে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া নল পুষ্করের সহিত পাশাক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।

নলের একে একে সর্ব্বস্ব গেল। রাজ্য ধন যাহা কিছু ছিল সবই হারিলেন। রাজ্যে আর তাঁহার স্থান নাই। নিষধরাজ আজ পথের ভিখারী, বনবাস ভিন্ন আর উপায় নাই। সতী স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

রাজদম্পতী আজ বনবাসে। নল দময়ন্তীকে কহিতে লাগিলেন,—"প্রিয়ে! আমিই তোমার সকল কষ্টের কারণ, আর কেনই বা তুমি স্বেচ্ছায় এ ক্লেশ স্বীকার করিলে?" সতী উত্তর করিলেন—"নাথ! স্ত্রী কি কেবল স্বামীর সুখের অংশভাগিনী, দুঃখের ভাগিনী নয়? আপনার সুখের অংশ আমি তুল্যরূপেই ভোগ করিয়াছি, দুঃখের অংশ কেন ভোগ করিব না? আপনি যেখানে থাকিবেন সেখানেই আমার স্বর্গ; এ আমার স্বর্গবাস, আমি নিজের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিতা নহি, আমার চিন্তা—আপনার কত ক্লেশ হইতেছে।"

একবসনে রাজদম্পতী গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কলির মায়ায় একদিন একটি সুবর্ণপক্ষ-বিহঙ্গম ধরিতে গিয়া নল নিজের বসনখানি হারাইলেন। দময়ন্তী নিজের বস্ত্রের অর্দ্ধেক স্বামীকে দান করিলেন।

অযোধ্যারাজ ঋতুপর্ণ পাশাক্রীড়ায় অদ্বিতীয় ছিলেন। নল মনে করিলেন, তাঁহার নিকট হইতে পাশাক্রীড়া শিক্ষা করিয়া পুষ্করকে পরাজিত করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিবেন। কিন্তু এ হীনবেশে ছিন্ন-বসনে দময়ন্তীকে সঙ্গে লইয়া যেখানে গমন করা কিরূপে সম্ভবে! অগত্যা নল দময়ন্তীকে কহিলেন—"প্রিয়ে! তুমি বনবাসে বড়ই ক্লেশ পাইতেছ, কিছুদিনের জন্য পিতৃগৃহে গমন কর, দেখি যদি আমি কোন রূপে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারি।" সতী উত্তর করিলেন—"নাথ, তুমি বনবাস-ক্লেশ ভোগ করিবে, আর আমি তোমার পত্নী হইয়া পিতৃগৃহে সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটাইব? প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইব না।" নল যখন দেখিলেন দময়ন্তী তাঁহাকে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না, তখন একদিন রাত্রিকালে নিদ্রিতা দময়ন্তীর ভার একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে নল সে বন ত্যাগ করিলেন। সতী কিছুই জানিতে পারিল না।

নিদ্রাভঙ্গে সতী দেখিলেন স্বামী তাঁহার পার্শ্বে নাই, তিনি উন্মাদিনীর মত নানাস্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু নলের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। পতির এই ব্যাপারে সতীর বিন্দুমাত্র বিরক্তি ভাব আসিল না। ভাবিলেন, আমারই দোষ, কেন আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম? পতির অদর্শনে সতী উন্মাদিনী হইলেন।

এরূপ অবস্থায় দময়ন্তী একদিন এক অজগর সর্পের মুখে পতিত হইলেন। প্রাণভয়ে দময়ন্তী দৌড়িতে লাগিলেন। সর্প তাহাকে ধরিবার উপক্রম করিয়াছে, মুহূর্ত্তে মধ্যে একটী তীর আসিয়া সর্পকে বিদ্ধ করিল। সর্প গতাসু হইয়া ভূতলে পড়িল। দময়ন্তী দেখিলেন

এক ব্যাধ তাহার প্রাণদাতা। তিনি জীবনদাতার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন যে জীবনদান করাই তাহার উদ্দেশ্য নয়। পাপাভিলাষ পূর্ণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। সতী ঘৃণায় সে স্থান ত্যাগ করিলেন। কিন্তু পাপাত্মা তাঁহাকে ধরিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিয়া ছুটিল। মূহূর্ত্তে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। সতীর কণ্টক ঘুচিল।

চেদীরাজ্যে দময়ন্তী দেখিলেন কতকগুলি বণিক্ পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেছে। তিনি তাহাদের অনুসরণ করিলেন, কিন্তু রাত্রিকালে কতক-গুলি বন্য গজের সহিত বণিকদের, ভারবাহী গজের যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় দময়ন্তী প্রাণভয়ে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। উন্মাদিনীর ন্যায় ছিন্নবসনে, কর্দ্দমাক্তশরীরে চেদিনগরে রাজপথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলে রাজমাতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া দাসী দ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও তাঁহার পরিচয় পাইয়া সস্নেহে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। রাজমাতা তাঁহার স্বামীর সন্ধান করিতে লাগিলেন।

এদিকে নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দুর আসিয়া দেখেন যে দাবানলে এক প্রকাণ্ড সর্প দগ্ধপ্রায় হইয়াছে। স্বভাবকরুণ নল নিজের বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া সর্পকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু হিংস্র সর্প তাহার নিজের স্বভাব ত্যাগ করিতে পারিল না; সে নলকে দংশন করিল। তাহার বিষে নলের সর্ব্ব শরীর বিবর্ণ ও মুখমণ্ডল ব্রণদ্বারা বিকৃত হইয়া গেল। এরূপ বিকৃতি ছদ্মবেশের উপযুক্তই হইল।

নল অশ্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া

ঋতুপর্ণের নিকট সারথ্য স্বীকার করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল বাহুক। ঋতুপর্ণ নলের উপর পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

এদিকে বিদর্ভরাজ কন্যা ও জামাতার বনগমন সংবাদে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদিগকে গৃহে আনিবার জন্য দূত সকল প্রেরণ করিলেন। নানাবন নানাদেশ অন্বেষণ করিয়া দূতগণ চেদিরাজ্যে উপস্থিত হইল। সেখানে দময়ন্তীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে সসম্মানে বিদর্ভরাজ্যে লইয়া গেল।

পিতৃগৃহে সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে সতীর মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। রাত্রিদিনই তিনি পতির চিন্তায় মগ্ন; রাত্রিদিনই পতির জন্য তাঁর অশ্রুধারা! ভীম জামাতার অন্বেষণে পুনরায় দূত প্রেরণ করিলেন।

এক দূত আসিয়া দময়ন্তীকে ঋতুপর্ণের সারথির কথা বলিল। তাঁহার গুণের পরিচয়, দময়ন্তীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ইত্যাদিতে দময়ন্তী তাঁহাকে নল বলিয়াই মনে করিলেন, কিন্তু তাঁহার রূপের বর্ণনায় তিনি একটু সন্দিহান হইলেন। যাহা হউক. তাঁহাকে দেখিবার জন্য দময়ন্তী এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

ঋতুপর্ণের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়া দময়ন্তী জানাইলেন যে নল নিরুদ্দেশ বলিয়া দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবর উপস্থিত। ঋতুপর্ণ দময়ন্তীর রূপ গুণের কথা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে অতি সত্বর বিদর্ভে যাত্রা করিকার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নল এ কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কৌশল আছে। যাহাহউক নল ঋতুপর্ণের সারথি হইয়া বিদর্ভে আসিলেন।

দময়ন্তী গোপনে বাহুককে ডাকাইয়া তাঁহার আচার ব্যবহারে তাঁহাকে নল বলিয়া চিনিতে পারিলেন। উষ্ণ অশ্রুজলে পুনরায় দুইটী হৃদয় মিলিত হইল।

নল ও দময়ন্তী নিষধে গমন করিয়া পুষ্করকে পাশা ক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। নল ঋতুপর্ণের নিকট পাশা ক্রীড়ার সমস্ত কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পুষ্করকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিলেন। সতীর দুঃখের অবসান হইল।

শকুন্তলা

কোন সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি মহাতপে নিমগ্ন হন। দেবতারা সেই তপস্যা দর্শনে ভীত হইয়া মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য প্রেরণ করেন। মেনকা রূপমোহে বিশ্বামিত্রকে মুগ্ধ করেন। ফলে মেনকার গর্ভে তাঁহার ঔরসে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মেনকা সদ্যঃপ্রসূতা সেই কন্যাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। দেবতারা নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিশ্বামিত্রও কন্যাটী গ্রহণ করিলেন না। অসহায়া কন্যাটীকে একটি শকুনি তাহার পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। দৈবযোগে মহর্ষি কণ্ব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কন্যাটীকে তদবস্থ দেখিতে পান। স্বভাবকরুণ ঋষি শিশুটীকে নিজের আশ্রমে লইয়া আসিয়া নিজের কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতে লাগিলেন। শকুনি বা পক্ষী পালন করিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল শকুন্তলা।

শকুন্তলা দিন দিন শশিকলার মত বাড়িতে লাগিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুইটী সহচরীর সহিত মনের আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। আশ্রমের বৃক্ষমূলে জল সেচন করেন, তরুলতার বিবাহ দেন, আদর করিয়া তরুলতার কত নাম রাখেন। সখীরা তাঁহার সব কাজে সহায়তা করিত। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা যৌবনদশায় উপস্থিত হইলেন, রূপ উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে একদিন মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে আসিয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত হন। কণ্ব সে সময় তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন, আশ্রমের ভার শকুন্তলার উপরই ছিল। শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হন এবং শকুন্তলাও দুষ্মন্তদর্শনে মুগ্ধা হইলেন। সখীদের মুখে দুষ্মন্ত শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিবাহযোগ্যা বলিয়া মনে করিয়া তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেন। বিবাহ-সাক্ষী স্বরূপ শকুন্তলাকে একটি অঙ্গুরী দিয়া রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন তিনি সত্বরই তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন।

একদিন শকুন্তলা কুটীরদ্বারে বসিয়া দুষ্মন্ত-চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া আতিথ্য প্রার্থনা করিলেন। শকুন্তলা পতিচিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য,তিনি দুর্ব্বাসার কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা তখন ক্রোধে তাঁহাকে শাপ দিলেন—"তুই যাহার চিন্তায় মগ্ন হইয়া আমাকে অবমাননা করিলি, আমি অভিশাপ দিতেছি, যে তুই স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তোকে স্মরণ করিবে না।" শকুন্তলা কিছুই জানিতে পারিলেন না, অনসূয়া নিকটে ছিল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে

ঋষির নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। বহু আরাধনায় ঋষির ক্রোধ একটু প্রশমিত হইল। তিনি কহিলেন—"যদি কোন চিহ্ন দর্শাইতে পারে, তবেই ইহাকে স্মরণ করিবে, অন্যথা নয়।" অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে এ ঘটনা জানাইল, শকুন্তলাকে কেহ কিছু বলিল না।

কণ্ব তীর্থে দৈববাণী হইতে জানিলেন যে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং শকুন্তলা গর্ভবতী। তিনি পূর্ব্ব হইতেই শকুন্তলার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন, এক্ষণে দুষ্মন্তের সহিত বিবাহে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কেননা দুষ্মন্ত অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত পাত্র কে হইতে পারে। তিনি সত্বর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, স্নুতরাং তিনি স্বয়ং তাহাকে লইয়া যান্ নাই।

শুভদিনে কণ্ব দুই শিষ্য ও ভগ্নী গৌতমীকে সঙ্গে দিয়া শকুন্তলাকে রাজধানীতে পাঠাইলেন। শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে পিতা ও অন্যান্য গুরুজন, সখীগণ ও আশ্রমের বৃক্ষ সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সখীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে নিভৃতে বলিয়া দিলেন, "রাজা অবিশ্বাস করিলে এই অঙ্গুরীয় তাঁহাকে দেখাইও।" তাঁহারা আশ্রম ত্যাগ করিলেন।

পথে শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় শকুন্তলার সেই অঙ্গুরীয় স্খলিত হইয়া জলমগ্ন হইল, শকুন্তলা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে রাজপ্রসাদে উপস্থিত হইলেন।

দুর্ব্বাসার শাপে শকুন্তলা সম্বন্ধে কোন কথাই দুষ্মন্তের মনে ছিল না,

সুতরাং তিনি কোন ক্রমেই শকুন্তলাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। শকুন্তলা লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলেন।

শিষ্যদিগের সহিত রাজার অনেক তর্কের পর শকুন্তলা নিজেই তাঁহার পত্নীত্ব প্রমাণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। পরে অঙ্গুরীর কথা তাঁহার মনে পড়িল, কিন্তু তাহা দেখাইতে গিয়া দেখেন অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকট নাই। শকুন্তলা নিরুপায় হইলেন। শিষ্যেরা শকুন্তলাকে সেখানে রাখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেল। শকুন্তলা একাকী কাঁদিতে লাগিলেন, মেনকা আসিয়া আকাশ-পথে তাঁহাকে লইয়া সুমেরু পর্ব্বতে ভগবান্ কশ্যপের নিকট উপনীত হইল। কশ্যপ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যথাকালে শকুন্তলা সেখানে একটী পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। পুত্রের নাম হইল ভরত।

ইতিমধ্যে এক ধীবর শচীতীর্থে একটী রোহিত মৎস্য ধরিয়া বিক্রয়ার্থ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার উদর মধ্যে একটী অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হয়। সে উহা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত এক স্বর্ণকারের নিকট উপস্থিত হইলে, স্বর্ণকার উহাতে রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া নগরপালের হস্তে সমর্পণ করে। নগরপাল চোরকে অঙ্গুরীর সহিত রাজার নিকট উপস্থিত করে। অঙ্গুরীয় দর্শন মাত্রেই রাজার শকুন্তলা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই মনে পড়িল, এবং শকুন্তলার প্রতি এই দুর্ব্ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং কিরূপে শকুন্তলাকে পুনরায় লাভ করিবেন সেই চিন্তায় দিবানিশি অস্থির হইলেন।

একদিন ইন্দ্রসারথি মাতলি আসিয়া 'দানব বিজয় জন্য ইন্দ্র আহ্বান করিয়াছেন' বলিয়া দুষ্মন্তকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। স্বর্গ হইতে

প্রত্যাবর্ত্তন কালে মাতলি সুমেরু পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলে দুষ্মন্ত মহর্ষি কশ্যপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। দুষ্মন্ত রথ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে মহর্ষির কুটীরের দিকে যাইতে লাগিলেন পথিমধ্যে দেখিলেন একটী বালক এক ভীষণ সিংহকে নির্য্যাতন করিতেছে। তিনি স্তম্ভিত হইলেন। বালক কাহারও কথা শুনিতেছে না। অবশেষে 'খেলনা দিব' এই কথায় সে শান্ত হইল।

বালককে দর্শনাবধি দুষ্মন্তের মনে এক অনির্ব্বচনীয় বাৎসল্যভাবের সঞ্চার হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন সে তাঁহার পুত্র। তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য তিনি বড় ব্যগ্র হইলেন। একটী মাটীর ময়ূর আনিয়া বালককে দেওয়া হইল। "দেখ, কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ"—এই কথা শুনিয়া বালকটী "কৈ মা কৈ ?" বলিয়া উঠিল। রাজা বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এ কি শকুন্তলার পুত্র! ঘৃণিতা, অপমানিতা, বিতাড়িতা, নিজের পরিণীতা পত্নী শকুন্তলার পুত্র! রাজা অস্থির হইলেন। কিছু পরেই শকুন্তলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—দীনা, হীনা, মলিনা, ব্রহ্মচারিণী। উভয়েই উভয়কে চিনিতে পারিলেন। উভয়ের চক্ষুজলেই যেন সমস্ত অপরাধ ধৌত হইয়া গেল। রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মহর্ষির আশীর্ব্বাদ লইয়া, পত্নী পুত্র সঙ্গে লইয়া দুষ্মন্ত রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। যথাকালে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দুষ্মন্ত সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। শকুন্তলার পুত্র ভরত হইতে আমাদের দেশের নাম 'ভারতবর্ষ' হইয়াছে।

——

দ্রৌপদী

দ্রৌপদী পঞ্চ ভর্ত্তৃকা হইয়াও হিন্দুদের প্রাতঃস্মরণীয়া, ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে একপতি নারীগণ হইতে দ্রৌপদীর সম্মান কম নহে। এক পত্নীর পক্ষে একমাত্র স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা ভক্তি কঠিন নহে। কিন্তু পঞ্চ পতিকে একস্বামী জ্ঞানে তুল্যভাবে পূজা ভক্তি অতি দুরূহ ব্যাপার। অসাধারণ শক্তিশালিনী দ্রৌপদী সে কার্য্যেও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বড় কঠিন কাজ—বড় শক্ত ব্যাপার। তাই দ্রৌপদী অজ্ঞাতসারে অর্জ্জুনের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাত যুক্ত ছিলেন বলিয়াই মহাপ্রস্থান সময়ে তিনি স্বশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই, তাঁহার পতন হইয়াছিল। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনং। পিণ্ডার্থ একমাত্র পুত্র ভিন্ন দ্বিতীয় পুত্রও কামজ পুত্র। দ্রৌপদীর যৌন সম্বন্ধ কামজ নহে। তাই তাঁহার পঞ্চ পতিতে এক একটীর অধিক পুত্র হয় নাই; অথচ পুরাণে শত হইতে লক্ষ পুত্রের উৎপত্তি বিবরণও পাওয়া যায়।

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গ্রহণ নিজ ইচ্ছাকৃত বা কামপরবশ হইয়া নহে, একথা সকলেই জানেন। ইহাঁর পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং ঋষি দেবতা ও শাশুড়ী দেবীর আদেশে ইনি পঞ্চ পাণ্ডবকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। দ্রৌপদীর জন্ম প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয় কৌরব ও ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংসের জন্যই ধূমকেতুর মত তিনি যজ্ঞ

হইতে সমুদ্ভূতা। সীতা সাবিত্রীর মত সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াও ইনি ক্ষত্রিয় স্ত্রীর মত বল বিক্রমে দুঃশাসন জয়দ্রথ ও কীচকের হাত হইতে নিজ সতীত্ব রক্ষা করিয়া জগতে বীর-রমণীর আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন রাজমহিষী দ্রৌপদীর ন্যায় নিজগুণে স্বামীকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীকে তর্জ্জনী হেলনে পরিচালিত করিবার শক্তি রাখিতেন এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হাতের মুঠার মধ্যে রাখিয়াছিলেন। সংসারের কর্ত্তবা, রাজ মহিষীর কর্ত্তব্য, অতিথি সৎকার, রন্ধনাদি কার্য্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা গুণ দ্রৌপদীব অসাধারণ ছিল। দ্রৌপদী সতীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। মহাভারতের মত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক ইতিহাসের প্রধান নায়িকা। যজ্ঞ হইতে সমুদ্ভুতা তাই দ্রৌপদীর এক নাম যাজ্ঞসেনী, দ্রুপদ রাজার একমাত্র তনয়া বলিয়া দ্রৌপদী, পাঞ্চাল রাজকন্যা বলিয়া নাম পাঞ্চালী, গাত্র রং অনুযায়ী নাম কৃষ্ণা। দ্রৌপদীর জীবনীর অবতারণা করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে একরূপ অসম্ভব হইলেও আমরা সত্যভামা দ্রৌপদী সংবাদ পাঠিকাদিগকে উপহার না দিলে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে তাই অতি সংক্ষেপে দ্রৌপদীর চরিত্র বর্ণনা করিতেছি।

তিন জন্ম পূর্ব্বে ইনি এক দক্ষের কন্যারূপে স্বামীলাভের জন্য হিমালয়ে তপস্যা করিবার সময় গো-মাতা সুরভির বিরক্তিসূচক কাজ করিয়াছিলেন। সেই জন্য গোমাতা ইঁহাকে তিন জন্মে কুমারীত্ব ঘুচিবে না এবং চতুর্থ জন্মে পাঁচ জন স্বামী হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করেন। কিছুদিন পরে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া ইঁহার পাণি প্রার্থনা করেন। দেবগণের এই ব্যবহারে ইনি শিব ও

বিষ্ণুর নিকট ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করায় বিষ্ণু দেবগণকে এই বলিয়া শাপ দিলেন "তোমরা দেবতা হইয়াও যেমন নরকন্যা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ তেমনি তোমরা নররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ কন্যাকে একদিন লাভ করিবে। আমিও নরলোকে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ও অধর্ম্মের বিনাশের জন্য সেই সময় ধরাধামে অবতীর্ণ হইব। প্রথম জন্মে পাছে বহুপতি লাভ ঘটে এজন্য ঐ কন্যা গঙ্গার জলে অকালে দেহত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় জন্মে ইনি আবার এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎস্বামী লাভের জন্য প্রত্যহ শিবপূজা করিয়া পাঁচ বার "পতিং দেহি" বলিয়া বর চাহিতেন। শিব ইঁহার পূজায় একদিন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তথাস্তু," অর্থাৎ তোমার পঞ্চস্বামী হইবে। এবারও তিনি পঞ্চপতি হইবার আশঙ্কায় গঙ্গার স্মরণ লইলেন।

তৃতীয়বার তিনি কাশীরাজ কুমারী হইয়া হিমালয়ে সৎস্বামী লাভের জন্য শিবপূজায় নিরতা হন এবং ইন্দ্র, ধর্ম্ম, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নয়ন পথে পতিতা হন। এবার দেবতারা ইঁহাকে বলেন আমাদের কাহাকেও তুমি পতিরূপে বরণ কর, কিন্তু সকলের আকার প্রকার একই রকম হওয়ায় কাহাকে অপমান করিয়া কাহাকে সম্মানিত করিবে যখন ভাবিয়া পাইতেছেন না, তখন সকলেই বলিয়া উঠিলেন "আমরা সকলেই তোমার স্বামী হইব"। এবারও তিনি গঙ্গার আশ্রয় লইলেন।

যাহাহউক চতুর্থজন্মে প্রাক্তন ফল এড়াইতে না পারিয়া পঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদের যজ্ঞ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণার উদয় হইল। পরে হস্তিনার রাজপরিবারের পাণ্ডবেরা ইঁহার স্বামী হইলেন।

দ্বাপর যুগে হস্তিনাপুরে বিচিত্রবীর্য্য নামে এক চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজ্য শাসন করেন। কালে অন্ধরাজার ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্রের জন্ম হয়। ইহারা কৌরব নামে খ্যাত এবং পাণ্ডু মহিষী কুন্তির গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল সহদেবের জন্ম হয় ইহাদের নাম হইল পাণ্ডব। কিছুদিন পরে পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে যুধিষ্ঠির ন্যায়ধর্ম্মানুযায়ী রাজা হইবেন স্থির হইলে কৌরবেরা ছলে বলে ইহাদের পাঁচ ভাই ও মাতা কুন্তিকে বনবাসে পাঠান এবং সেখানে যে গৃহে ইহাঁরা বাস করিতেন তাহা দগ্ধ করিয়া ইহাঁদের পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা করেন। ইহারা কৌশলে সেই যতুগৃহ দাহ হইতে রক্ষা পাইয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে থাকেন। এই সময়ে ইহাঁরা সংবাদ পান দ্রুপদকন্যার বিবাহে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ইহাঁরাও কোন আশায় দ্রুপদরাজ সভায় ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হন।

এদিকে দ্রুপদরাজ সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যারত্নের উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিতে না পারিয়া এক স্বয়ম্বরসভার রচনা করিয়া একটী চক্রযন্ত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক খুব উচ্চে বসাইয়া ঐ যন্ত্রটীর ঠিক মাঝখানে এক ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিয়া উহার অনেক উপরে একটী কৃত্রিম সোণার মাছ স্থাপন করিলেন। উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেহ ঐ ঘুর্ণায়মান রাধাচক্রের ছিদ্র দিয়া ঐ মৎস্যের সন্ধান পান না তাই নীচে উহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিবার জন্য একটী স্বচ্ছ জলের চৌবাচ্চা

করাইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, জলের ভিতর প্রতিবিম্ব দেখিয়া ঐ রাধাচক্রের উপরিস্থিত মৎস্যকে ভূমিসাৎ করিতে যিনি পারিবেন তিনিই দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করিবেন।

সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজন্য একে একে ব্যর্থকাম হইয়া লজ্জায় অপমানে পলায়ন করিতে লাগিলেন তখন ঘোষণা করা হইল ক্ষত্রিয় রাজা হউক কিম্বা ব্রাহ্মণাদি অন্য জাতি হউক যে কেহ ঐ মৎস্য বিদ্ধ করিবেন তিনিই দ্রৌপদী লাভ করিবেন। অর্জ্জুন এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির ভীমের অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মণ সভা হইতে বাহিরে আসিয়া সেই বৃহৎ ধনুকে শর যোজনা করিয়া মৎস্য বিদ্ধ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদী তাঁহাকে পতীত্বে বরণ করিয়া গলায় পুষ্পহার দিলেন ইহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজার ক্রোধ হইল এবং অর্জ্জুনের সহিত সকলে যুদ্ধে ব্রতী হইলেন কিন্তু সকলেই পাণ্ডবদের নিকট হারিয়া পলায়ন করিলেন।

দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বর সভা হইতে যখন অর্জ্জুন বন-গৃহে আনিয়া মাতাকে জানাইলেন যে, আজ একটী নূতন জিনিস ভিক্ষায় পাইয়াছেন তখন মাতৃদেবী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আদেশ করিলেন, "যাহা পাইয়াছ পাঁচজনে ভাগ করিয়া লও"। এখন সমস্যা গুরুতর হইল, দ্রৌপদী ভাবিয়া আকুল হইলেন। মাতা কুন্তি যখন জানিলেন অর্জ্জুনই দ্রৌপদীর প্রকৃত স্বামী এবং দ্রৌপদীর সতীত্বধর্ম্ম বিরোধী আজ্ঞা তিনিই দিয়া বসিয়াছেন তখন তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং সত্য রক্ষা যাহাতে হয় সে বিচারের ভার জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিলেন। যুধিষ্ঠির সমস্ত ঋষি ও গুরুজনের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীকে

বিবাহ করিবেন স্থির করিলেন। অগত্যা দ্রৌপদীও ভগবানকে স্মরণ করিয়া পঞ্চ ভ্রাতাকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

সেই দিন যুধিষ্ঠির ব্যতীত অপর চারিভ্রাতা ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা পাইলেন তাহা কুন্তীদেবীর আদেশে যুধিষ্ঠির, দেবতা ব্রাহ্মণ মাতা স্ত্রী ও পাঁচ ভাইকে ভাগ করিয়া দিলেন। বিবাহের প্রথম দিনই রাজকন্যা ভিক্ষান্নে জীবন যাপনে কুণ্ঠিতা হইলেন না বা রাত্রিকালে কুশশয্যায় শয়নে ক্লেশ বোধ করিলেন না।

দ্রুপদরাজ এ সংবাদ শুনিলেন এবং সকলেই জানিতে পারিল অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন তখন দ্রুপদরাজ সমস্ত রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চপাণ্ডবের হাতে মহাসমারোহে দ্রৌপদীকে সমর্পণ করিলেন। এই সময়ে দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় অগ্রজ বলদেব সেখানে উপস্থিত থাকিয়া এ বিবাহ সমর্থন করিলেন।

দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরে ফিরিয়া স্বয়ম্বর সভার সংবাদ পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইল। অন্ধরাজা, ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর প্রভৃতি বিচক্ষণ ধার্ম্মিক আত্মীয়স্বজন ও সভাসদদের কথামত পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরে আনাইয়া অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। অতঃপর ইহাঁদের রাজধানী হইল ইন্দ্রপ্রস্থ। যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মরাজকে পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, সকল শ্রেণীর লোকের একত্র সমাবেশ হইল। গৌরবে শ্রীসম্পদে সুরম্য হর্ম্ম্যে ইন্দ্রপ্রস্থ সকল রাজধানীকে পরাজিত করিল। পাণ্ডবেরাও আনন্দে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদিন দেবর্ষি নারদ আসিয়া পাণ্ডবদিগকে বলিলেন "পাঁচ ভাইয়ের যখন একই স্ত্রী তখন পাছে এই স্ত্রী

লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ হয় এজন্য তোমরা এক বৎসর করিয়া এক একজন দ্রৌপদীকে গৃহে রাখিবে। যদি কোন ভাই অপর ভাইয়ের আশ্রয় কালীন বা স্বামী স্ত্রী একত্র বাসকালীন কেহ দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাঁহাকে দ্বাদশবর্ষ স্বেচ্ছায় বনবাস যাইতে হইবে।"

একদিন যখন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী অস্ত্রাগারে ছিলেন সেই সময় এক ব্রাহ্মণকে শত্রু হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র আনিতে অর্জ্জুনকে বাধ্য হইয়া অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে হয়; এবং দ্বাদশবর্ষ বনবাসে যাইতে হয়, এবং সেই বনবাস সময়ে তিনি দেবকার্য্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে তিনি নাগ কন্যা উলূপী, মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। পরে তাঁহার বনবাস সময় উত্তীর্ণ হইলে তিনি সুভদ্রাকে লইয়া গৃহে ফেরেন।

নূতন বিবাহিতা স্ত্রী সুভদ্রাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া প্রথমে তিনি মাতৃদেবীর চরণ বন্দনা করিয়া একে একে গুরুজন সকলেরই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং দ্রৌপদীর নিকট গিয়া সুভদ্রাকে উপহার দিলেন। দ্রৌপদী স্বামীর পর পর কয়েকটী বিবাহ শুনিয়া একটু অভিমান করিয়াছিলেন বটে কিন্তু স্বামী আসিয়া যখন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে উপহার দিলেন এবং সুভদ্রা যখন বলিলেন "দিদি আমি তোমার দাসী" তখন দ্রৌপদীর স্বপত্নী-দুঃখ কোথায় উড়িয়া গেল। স্বয়ম্বর-জয়ী বীর-শ্রেষ্ঠ স্বামীর নূতন বিজয়-গৌরব সুভদ্রা, এই যখন তাঁহার মনে হইল তখন তিনি সুভদ্রাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া লইয়া বলিলেন "বোন আমি এই আশীর্ব্বাদ করি যেন তুমি চির স্বামী সোহাগিনী হও।"

কিছুকাল পরে সুভদ্রার এক পুত্র হইল তাহার নাম রহিল অভিমন্যু। দ্রৌপদীরও পর পর পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে পাঁচটী পুত্র হইল। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞসভা অসাধারণ কারুকার্য্যময় হইল। যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন সঙ্গে বলদেবও আসিলেন। অন্যান্য রাজারাও আসিয়াছিলেন এবং হস্তিনা-পুরের বর্ত্তমান রাজা কৌরবদের জেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্য্যোধন এবং তাঁহাদের মাতুল শকুনি আসিয়া পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়া হিংসায় জ্বলিতে লাগিলেন।

খলেরা হস্তিনায় ফিরিয়া পাণ্ডদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পথও বাহির হইল। দুর্য্যোধন প্রভৃতির মাতুল পাশা খেলায় অদ্বিতীয় ছিলেন। মাতুল শকুনি পরামর্শ দিলেন কপট পাশা খেলায় পাণ্ডবদিগকে হারাইয়া উহাদের রাজত্ব গ্রহণ ও অপমান না করিলে যুদ্ধে উহাদিগকে পরাজিত করা যাইবে না। সেকালে ক্ষত্রিয় রাজাদের যুদ্ধ বা পাশা খেলায় আহ্বান করিলে ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে যুদ্ধ বা পাশা খেলায় 'না' বলিবার মত অপমান আর কিছুই ছিল না। ইহাঁরা যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করিলেন এবং পর পর হারাইয়া দিতে লাগিলেন যধিষ্ঠির রাজ্য ও পাঁচ ভাইকে পণ রাখিয়া হারিয়া গেলেন। শেষে শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন এবং এবারও হারিয়া গেলেন।

কৌরবেরা দ্রৌপদীকে কৌরব-রাজসভায় আনিবার জন্য লোক পাঠাইলে তিনি সভায় আসিতে অস্বীকার করিলেন এবং সেই দুতকে বলিয়া পাঠাইলেন আগে জানিয়া আইস "ধর্ম্মরাজ আগে আমায় পণ

রাখিয়া হারিয়াছেন বা নিজেকে হারাইয়া আমায় পণ রাখিয়াছেন।” এ কথার জবাবে বিদুর, ভীষ্ম প্রভৃতি সভাস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্রৌপদীর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া দুর্য্যোধনকে জানাইলেন যে দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার অধিকার ধর্ম্মরাজের নাই, কারণ ধর্ম্মরাজ আগেই পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ‘চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী’ দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে দ্রৌপদী আনায়নে পাঠাইলেন। দ্রৌপদী এবারও আপত্তি করায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করিতে করিতে সভায় লইয়া আসিলেন। দ্রৌপদী ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া সভাস্থ সকলকেই বিনয় অনুরোধ প্রভৃতি করিয়া জানাইলেন যে, “ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে হারিয়া পরে আমাকে হারিয়াছেন অতএব আমাকে অপমান করিবার কৌরবদের অধিকার নাই। পরন্তু তাহারা আমাকে এইরূপভাবে যখন অপমান করিতে বদ্ধ পরিকর তখন কি বুঝিতে হইবে ধর্ম্ম একেবারেই ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে? কুরুগণই ত ধর্ম্মরাজকে পাশাখেলায় জোর করিয়া আবদ্ধ করিয়াছে, এবং শকুনি চাতুরী অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে হারাইয়াছে, বুঝিলাম না ধর্ম্মরাজ কি হিসাবে হারিলেন”। ইহাতে যখন তাঁহার কথার সদুত্তর কেহ দিল না এবং কৌরবেরা “দাসী” বলিয়া কেবলই সম্বোধন করিতে লাগিল তখন তিনি স্বামীগণের তেজ উদ্দীপিত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাঁহারা কেহ স্বাধীন নহে সকলকেই যুধিষ্ঠির পণে হারাইয়াছেন।

দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় ভীম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভীমগর্জ্জনে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “জুয়াড়িরা দাস দাসীকে কখনও পণ রাখিতে পারেনা। আপনি সমস্ত রাজ্য দাসদাসী

ও আমাদিগকে হারাইয়াছেন। আপনি নিজেকে হারাইয়া পরে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন অতএব দ্রৌপদীকে অপমান করিতে আমি দিব না।”

পাছে ভীম ক্রোধের বশে ধর্ম্মরাজকে আরও রূঢ় কথা বলেন এজন্য অর্জ্জুন তাড়াতাড়ি ভীমের পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে নানারূপ যুক্তি দেখাইয়া নিরস্ত করেন। ইহাতে কৌরবদের আর প্রতিবন্ধক রহিল না দেখিয়া দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করিবার জন্য সকলের সমক্ষে কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিলেন।

এখন দ্রৌপদী নিরুপায় হইয়া সভাস্থ গুরুজন ও স্বামীদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। “আজ গুরুজন ও সভ্যদের সমক্ষে পিশাচেরা স্ত্রীজাতির সর্ব্বস্ব লজ্জা নষ্ট করিতে উদ্যত, সভাস্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কেহই প্রতিবাদ করিতেছেন না। বুঝিলাম এতদিনে ভারতের সর্ব্বধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে চলিল। স্বামিগণ অতুলনীয় বীর হইয়াও ধর্ম্ম বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া আজ তাঁহাদের নারীর অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিতেছেন না। কিন্তু জানিও যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন ভগবান নিজে আসিয়া সতীদের রক্ষা করিবেন এবং দুষ্কৃতেরা তাঁহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।”

দুঃশাসনও ছাড়িবার পাত্র নহে। দ্রৌপদীর ধর্ম্মকথায় কর্ণপাত না করিয়া কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। দ্রৌপদী বস্ত্রধারণে অপারগ হইয়া করযোড়ে কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। দুঃশাসন আর কোন বাধা না পাইয়া সজোরে কাপড় টানিতে লাগিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যত কাপড় টানে ততই নানাবর্ণের রাশি রাশি

কাপড় দ্রৌপদীর গাত্র হইতে বাহির হয়। রাজসভাস্থল কাপড়ে ভরিয়া গেল কিন্তু দ্রৌপদী বিবস্ত্রা হইলেন না। ভীম ধৈর্য্য হারাইয়া আবার উঠিয়া দুঃশাসনকে বলিলেন "পাষণ্ড তোর ইহাতেও যখন জ্ঞান হইতেছে না, তোদের সকলকে মেষপালের মত মনে করিয়া এযাবত ক্ষমা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আর ক্ষমা করিব না, তোর বক্ষ নখের আঘাতে বিদীর্ণ করিয়া জীবন্ত হৃদপিণ্ড বাহির করিয়া রক্তপান যদি না করি এবং সেই রক্তে কৃষ্ণার বেণী বন্ধন না করিয়া দিই তাহা হইলে যেন আমার সদগতি না হয়।"

সভাস্থ সকলেই ভয়বিহ্বল হতভম্ব। দুর্য্যোধন আবার দ্রৌপদীকে ইঙ্গিত করিয়া উরুতে বসিতে বলিলেন। এবার ভীম ভ্রাতাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যে উরুতে পাপিষ্ঠ দ্রৌপদীকে বসাইবার বাসনা করিতেছে, অচিরেই সেই উরু ভঙ্গ করিব তবে আমার নাম ভীম। তোমাদের মারিবার জন্যই তোমাদের প্রদত্ত বিষ খাইয়া বা যতুগৃহে আমরা মরি নাই।"

যখন বিষয়গুলি আরও জটিল হইতেছে ও চারিদিকে অমঙ্গল ধ্বনি হইতেছে তখন সকলের জ্ঞান হইতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী এসব সংবাদে ব্যথিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া দ্রৌপদীকে কোলে লইয়া বর দিতে চাইলেন, দ্রৌপদীও শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "যদি আমার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন তাহা হইলে ধর্ম্মরাজকে কৌরবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত করুন।" ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে মুক্ত করিবার হুকুম দিয়া বলিলেন, "মা, আর কোন বর প্রার্থনা কর।" দ্রৌপদী বলিলেন, "নিজগুণে যদি আমায় আর বর দিতে অভিলাষী হন্

তাহা হইলে আমার আর চারি স্বামীকে মুক্তি দিন।” অন্ধরাজ পাণ্ডবদের সকলকেই মুক্তি দিবার হুকুম দিয়া তৃতীয় বর প্রার্থনার জন্য দ্রৌপদীকে অনুরোধ করিলে দ্রৌপদী বলিলেন, “হে ভারত কুলতিলক! আপনার ত জানাই আছে যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত তিন বর প্রর্থনা করিবার অধিকার কাহারও নাই। তাহার উপর অন্য সুখ সম্পদ যাহা কিছু প্রার্থনীয় তাহা আমি স্বামীদের নিকট হইতে না লইয়া কাহারও বরে সুখ সম্পদ ভোগ করিবার অভিলাষ করি না।” ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন “মা আমার সতী সাবিত্রীর ন্যায় তোমার গৌরব অক্ষুন্ন থাকুক, এবং চিরদিন স্বামী সেবা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ কর।”

মুক্ত হইয়া পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসহ ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে যাত্রা করিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন প্রভৃতি পিতার এই ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে নানা যুক্তি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন যে “আপনার হুকুম বহাল থাকুক কিন্তু উহাদিগকে আবার ফিরাইয়া আনুন। এবার আমরা যুধিষ্ঠিরের সহিত পাশা খেলিয়া দ্বাদশবর্ষ বনবাসের ব্যবস্থা করিব।” পুত্রবৎসল অন্ধ (তুমি ত চিরদিনই অন্ধ) পুত্রদের অনুরোধে পাণ্ডবদের ফিরাইয়া আনিতে হুকুম দিলেন পাণ্ডবেরা গুরুজনের আজ্ঞা অবহেলা না করিতে পারিয়া পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হইয়া দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়া লইলেন।

পাণ্ডবেরা গুরুজনদের প্রণাম করিয়া মাতৃদেবী কুন্তিকে ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ বিদুরের ঘরে এবং সুভদ্রাকে কৃষ্ণের আশ্রয়ে দ্বারকায় রাখিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া বনবাসে যাত্রা করিলেন। দ্রৌপদী যাইবার সময় কুরুকুল নারীগণের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় বলিলেন

"তোমাদের স্বামীরা যেমন আমায় বিবস্ত্রা ও খোলা চুলে আমাকে এই পথে যাত্রা করাইয়াছেন তখন আমরা ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের ঐ দশা দেখিব—আর দেখিব কি!—দেখিব তোমরা পতি পুত্র কন্যা হীনা হইয়া এইরূপ বেশে মৃতগণের তর্পণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতেছ।"

বনে গিয়া পাণ্ডবেরা সুখে বনবাস করিতে লাগিলেন। সেখানে ধর্ম্মরাজ আসিয়াছেন শুনিয়া নানাদিক দেশ হইতে সমস্ত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মুনি ঋষিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ লইতে আসিতেন, পাণ্ডবেরা ইহাঁদের যথোচিত সমাদর করিতেন এবং ইহাঁদের গৃহিণী স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম ও রন্ধন করিয়া স্বামী দেবতা অতিথি অভ্যাগত সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইতেন এবং সর্ব্বশেষে নিজে অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিতেন।

যখন কৌরবেরা শুনিল পাণ্ডবেরা বনে গিয়াও অশেষ প্রকার সুখ ভোগ করিতেছেন এবং দ্রৌপদীর গুণে অজস্র অতিথি পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া যাইতেছে তখন ইহাঁরা দ্রৌপদীর সতীত্বের গৌরব ক্ষুন্ন করিবার জন্য এবং পাণ্ডবদের অতিথি সৎকারে পরাঙ্মুখ করিবার জন্য দুর্ব্বাসার স্মরণাপন্ন হন্। যখন দুর্ব্বাসামুনি বহুসহস্র শিষ্য লইয়া পাণ্ডবদের অতিথি হইবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন তখন দ্রৌপদী ভোজ্যাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। উপায় কি? দ্রৌপদী ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। ভক্তবৎসল আসিয়া দেখা দিলেন এবং দ্রৌপদীর হাঁড়িতে কিছু আছে কিনা সন্ধান লইয়া দেখিলেন দ্রৌপদীর ভুক্তাবশিষ্ট একটী শাক আছে তাহাই ভগবান্ গ্রহণ করিয়া "তৃপ্তোস্মি"

বলিলেন। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে জগৎ তৃপ্ত হইল। দুর্ব্বাসা শিষ্যসহ ভোজনে তৃপ্ত হইয়া উদ্গার করিতে করিতে সে স্থান পবিত্যাগ করিলেন।

এই সময় ভগবানকে নিকটে পাইয়া দ্রৌপদী কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হে মধুসূদন! আমি পরম বীর্য্যবান্ পাণ্ডবগণের পত্নী, আমাব পুত্রগণ সকলেই বীর, আমি দ্রুপদ রাজকন্যা, বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয় সখী, তথাপি আমাকে কৌরবেরা কি করিয়া অপমান করিল?" প্রত্যুত্তরে ভগবান বলিলেন "অধর্ম্মনাশের জন্যই আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। তুমি কাঁদিওনা অধর্ম্মের বিনাশ তোমাব স্বামীগণ দ্বারাই করাইব। অর্জ্জুনের শরজালে বা ভীমের গদাঘাতে কেহই রক্ষা পাইবে না।"

একদা পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে বনে একাকী রাখিয়া মৃগয়ায় যান্। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই সময় ঐ বনে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীকে একাকী দেখিয়া তাঁহার সতীত্ব হরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকব হন। দ্রৌপদী ধর্ম্মকথায় জয়দ্রথকে পাপ বাসনা পরিত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু জয়দ্রথ না শুনিয়া তাঁহাকে রথে চাপাইলেন। দ্রৌপদী শত্রু বিনাশের উপায় উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া ভগবানকে স্মরণ করিতেছেন এমন সময় ভীমসেন আসিয়া রথ সমেত জয়দ্রথকে ধরিয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে আনিলেন। ধর্ম্মরাজ জয়দ্রথকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু দ্রৌপদী ভীমকে বলিলেন "উহাকে আমাদের দাসত্ব স্বীকার করাইয়া মাথা মুড়াইয়া ছাড়িয়া দেও।" দ্রৌপদীর কথায় জয়দ্রথ সম্মত হইলে ভীম উহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন।

দ্বাদশবর্ষ এইরূপে কাটিয়া গেল। এবার অজ্ঞাতবাসের পালা। এই সময়ে সকলে ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া বিরাট রাজের আশ্রয়ে চাকরীর অন্বেষণে গেলেন, বিরাটরাজ সকলকেই কাজে নিযুক্ত করিলেন। ভীম রাঁধুনি, দ্রৌপদী রাজপরিবারের বেশ-বিন্যাশ কার্য্যে সৈরিন্ধ্রি নামে এবং আর চারি ভাই অন্যান্য কার্য্যে রহিলেন। বিরাটরাজ-গৃহে সৈরিন্ধ্রির রূপ-লাবণ্য দেখিয়া দুষ্টের দল কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল। রাজশ্যালক কীচক নিজ বীরত্বে বিরাট রাজের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বোন্‌কে একদিন সৈরিন্ধ্রিকে তাঁহার বাসায় যাইতে বলায় তিনি সৈরিন্ধ্রিকে কীচকের বাসায় পাঠাইলেন। কীচক সৈরিন্ধ্রিকে একাকিনী পাইয়া নিজ কু-অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সৈরিন্ধ্রি এই অজ্ঞাত বাসে নিজ পরিচয় দানে অক্ষমা হইয়া বলিলেন—"আমার পঞ্চ-গন্ধর্ব্ব-স্বামী আছেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই আমাকে রক্ষা করিতেছেন।" কোনরূপে আমায় লাভ করিতে চাহিলেই তোমায় সংহার করিবেন। কিন্তু কীচক তবুও পাপাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। একাকিনী রমণী কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া ভগবানের স্মরণ লইলেন। কীচক তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানিল ইহাতে সৈরিন্ধ্রি রাগ সামলাইতে না পারিয়া নিজ বস্ত্র ছিনিয়া লইবার জন্য এমন টান দিলেন যাহাতে কীচকের মত বিরাটরাজের প্রধান সেনাপতি ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ইত্যবসরে দ্রৌপদী রাজসভায় যুধিষ্ঠিরের নিকট সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কীচকও রাগে অস্থির হইয়া সভা মাঝে আসিয়া দ্রৌপদীকে পদাঘাত করিল। ইহাতে দ্রৌপদী ভীমকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন "হে মধ্যম

পাণ্ডব তুমি ভিন্ন এ অপমানের প্রতিশোধ দিবার কেহ নাই।” পরে বিরাটরাজকে বলিলেন “মনে করিয়াছিলাম আপনি ধার্ম্মিক কিন্তু দেখিতেছি কীচক নির্দ্দোষ নারীর উপর এতাদৃশ অত্যাচার করিলেও আপনি কোন বিচার করিতেছেন না। আরও দেখিতেছি আপনার সভাসদগণের মধ্যে কেহই ধার্ম্মিক নহেন।” এই সময় ধর্ম্মরাজ ইঙ্গিত করিলে দ্রৌপদী অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

ইহাতে দ্রৌপদীর ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না, তিনি ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। ভীম বলিলেন “যদি কীচক পুনঃরায় পাপ প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে অন্তঃপুরে নৃত্যশালায় লইয়া আসিও, সেখানে আমি তাহার প্রাণ বধ করিব।” কীচকের লালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দ্রৌপদী-প্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিতে না পারিয়া পুনরায় দ্রৌপদীকে পাপবাসনা ব্যক্ত করিলেন। এবার দ্রৌপদী তাঁহাকে নৃত্যশালায় সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ভীম সৈরিন্ধ্রি-বেশে এক লাথিতে কীচক বধ করিলেন। কীচকের অন্যান্য ভ্রাতারা দ্রৌপদীকে কীচকের মৃত্যুর হেতু জানিয়া কীচকের সৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সৈরিন্ধ্রিরও সৎকার করিবেন বলিয়া দ্রৌপদীকে শ্মশানে ধরিয়া লইয়া গেলেন। ভীমও সংবাদ পাইয়া শ্মশানে গিয়া কীচকের একশত পাঁচ ভাইকে বধ করিলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল দ্রৌপদীর গন্ধর্ব্ব স্বামীরাই সর্ব্বনাশ করিতেছে। বিরাট রাজও ভয় পাইয়া দ্রৌপদীকে তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার আদেশ দিলেন। দ্রৌপদী ১৩ দিন সময় চাহিলেন। ইতি মধ্যে বিরাট রাজের বিরুদ্ধে কৌরব ও ত্রিগর্ত্তরাজ যুদ্ধ

ঘোষণা করিলেন। শত্রুপক্ষ ভীম ও অর্জ্জুনের বিক্রমে পলাইতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে এক বৎসর অজ্ঞাত বাস শেষ হইল। বিরাট রাজ প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুর সহিত নিজ কন্যা উত্তরার বিবাহ দিলেন।

পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্ত হইয়া নিজরাজ্য চাহিয়া কৌরবদের নিকট দূত পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীম বলিয়া দিলেন যদি কৌরবদের রাজ্য দিতে অসম্মতি থাকে তাহা হইলে অন্ততঃ পাঁচ ভাইয়ের বাস করিবার জন্য পাঁচখানি গ্রাম দিলেও আমরা শান্তিতে বাস করিতে পারিব। দুষ্ট দুর্য্যোধন দূতকে বলিয়া পাঠাইলেন "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"।

নিরুপায় হইয়া পাণ্ডবেরা যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৌরবপক্ষে পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত বড় বড় বীরেরা ও রাজারা যোগ দিয়াছেন। কেবলমাত্র দ্রুপদরাজা, তাঁহার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ প্রভৃতি ঘনিষ্ট আত্মীয়গণ পাণ্ডবপক্ষে রহিলেন। দ্বারকার রাজা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এখনও কোন পক্ষ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাকেই পাণ্ডবেরা দূতরূপে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য কৌরবদিগকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু দ্রৌপদী ছাড়িবার পাত্রী নহেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "হে মধুসূদন, জনার্দ্দন, কালীয় মর্দ্দন, কেশীনিসূদন দীনবন্ধু! ধর্ম্মরাজ জ্ঞাতিবধ ভয়ে সন্ধি করিতে চাহিতেছেন, আমারও ইচ্ছা নহে জ্ঞাতিবধ হয়, কিন্তু বধ্যকে বধ না করিলে যে পাপ হয় তাহাত' তুমি জান। অতএব আমি বেশী কথা বলিব না, কেবল এই কথা বলি যদি আমাদের হৃতরাজ্য কৌরবেরা প্রত্যর্পণ না করেন তাহা হইলে সন্ধি করিও না।"

বাসুদেব কৌরব সভায় সন্ধির প্রস্তাব লইয়া গেলে উহারা তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না বরং শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের পক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "পরে বলিব." কিন্তু কিছুদিন পরে কৌরবদের যাতায়াতে শ্রীকৃষ্ণ অতিষ্ঠ হইয়া বলিলেন "আমার নিদ্রাভঙ্গে যাহার মুখ আগে দেখিব সেই দিকে যাইব।" ধন মদে গর্ব্বিত দুর্য্যোধন সর্ব্বাগ্রে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের শিরোদেশের আসন গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন পায়ের কাছের আসন লইলেন। শ্রীকৃষ্ণ উঠিবার সময় অর্জ্জুনকে দেখিলেন। দুর্য্যোধনকে জানাইলেন পাণ্ডব পক্ষেই তাঁহাকে যাইতে হইবে তবে তাঁহার সমস্ত সেনা কৌরব পক্ষে থাকিবে। অতঃপর দুর্য্যোধনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না জানাইলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮দিন ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। অর্জ্জুন জ্ঞাতি-বধ ভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য রথ ফিরাইতে সারথি শ্রীকৃষ্ণকে বহু অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ ১৮দিন যুদ্ধের সময় নানারূপ ধর্ম্ম কথা ও যৌগিক পন্থা দেখাইয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে নিয়োগ করিলেন। ঐ উপদেশ বাণী "গীতা" নামে অভিহিত। ভীম কৌরব বংশ ধ্বংস করিলেন। অর্জ্জুন, ভীষ্ম কর্ণ প্রভৃতি মহারথীদিগকে বধ করিয়াছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিলেন। ভীষ্মদেব শরশয্যা গ্রহণ করিলেন। ভীম দুঃশাসনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বক্ষ বিদারণ করিয়া হৃদপিণ্ডের তপ্ত রক্ত পান করিলেন। অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পুত্রগণকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া গেলেন। সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু অন্যায় যুদ্ধে হত হইলেন। ভীম দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিলেন।

দ্রৌপদী পুত্রহন্তা অশ্বত্থামাকে বধ করিবার জন্য ভীমকে অনুরোধ করিলেন। ভীম অশ্বত্থামাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার মস্তকমণি আনিয়া দ্রৌপদীকে দিলেন। ভারতের ক্ষত্রিয় বংশ নির্ম্মূল হইল। কৌরব পক্ষে অন্ধরাজা ভিন্ন আর সব স্ত্রীলোকেরা রহিলেন। এপক্ষে পাণ্ডবেরা ও উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষিত রহিলেন। পাণ্ডবেরা রাজা হইলেন। কিছুদিন রাজকার্য্য করার পর উত্তরার শিশুপুত্র পরীক্ষিতকে রাজ্যভার দিয়া এবং সুভদ্রাকে তত্ত্বাবধান লইবার ভার দিয়া নিজেরা মহাপ্রস্থানে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ বলদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ধরাজা ও মহিষীগণ বনগমন করিয়াছিলেন।

দ্রৌপদী ও সত্যভামা সংবাদ

পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে একদিন কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা স্বামীসহ দ্রৌপদী দর্শনে যাত্রা করেন। সত্যভামা দ্রৌপদীকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর বলিলেন, "সখি! তোমার স্বামীগণ অদ্বিতীয় বীর, উহাঁরা তোমাতে সর্ব্বদাই আসক্ত। তুমি কি মন্ত্রবলে বা ব্রত, উপবাস, তীর্থ-জপযজ্ঞের দ্বারা উহাঁদিগকে এতাদৃশ বশীভূত করিয়াছ ?" দ্রৌপদী সত্যভামার কথায় হাসিয়া বলিলেন,—"সখি, এরূপ অদ্ভুত কথার জবাব আমার দিবার শক্তি নাই। ঐ সব উপায়ের কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। মন্ত্র, যাদু বা ঔষধাদি ইতর অশিক্ষিত নারীগণেরই স্বামী বশীকরণের ঔষধ। ইহাতে স্বামী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বশীভূত হয় না পরন্তু ঔষধাদি প্রয়োগে নানারূপ ব্যাধিগ্রস্থ হন্। অতএব এরূপ আচরণ নারীগণের কর্ত্তব্য নহে, স্বাধ্বী নারীরা কখনও ওসব পথ

অবলম্বন করেন না বরং ঘৃণা করেন, স্বামীরা ঐসব আচরণের কথা জানিতে পারিলে স্ত্রীতে অনুরক্ত না হইয়া ঘৃণাই করেন এবং জীবন-সংশয় বোধ করিয়া সর্ব্বদাই তাহার নিকট হইতে দূরেই থাকেন। সাপ লইয়া গৃহে বাসের ন্যায় সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করেন। অতএব সখী ওসব উপায়ে স্বামী বশ হয় না।

"আমি পঞ্চপাণ্ডবকে বশীভূত করিতে পারিয়াছি একথা যদি সত্য হয়, স্বামীরা আমাতেই একান্ত অনুরক্ত যদি স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতে হইল আমি কি করিয়া স্বামীদের মনোরঞ্জন করিয়াছি।

"ভগ্নি! আমি কাম ক্রোধাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পাণ্ডবগণের ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদের সেবা ও শুশ্রূষা করি। অভিমানিনী না হইয়া কোনরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ না করিয়া বা কোনরূপ অবাধ্য না হইয়া তাঁহাদের সকল ইঙ্গিত পালন করি। তাঁহাদের না দেখিলে প্রতি মুহূর্ত্ত আমার কাছে অন্ধকার বোধ হয়। তাঁহারা কোথাও গেলে আমি সকল ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করি এবং তাঁহাদের মঙ্গল-কামনায় তপস্যা প্রভৃতিতে আত্মনিয়োগ করি। আমি প্রত্যহ অতি যত্নে গৃহ-মার্জ্জনাদি করি, যথাসময়ে রন্ধন করিয়া স্বামীদের পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাই।

"কখন কোন দুষ্টস্বভাব স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশি না, একাকিনী যেখানে সেখানে যাই না বা গৃহদ্বারে বা গবাক্ষ পথে দাঁড়াই না। স্বামীগণের সহিত পরিহাসচ্ছল ভিন্ন অন্য কোন সময়ে উচ্চহাস্য করি না। এবং সর্ব্বদা সত্যপথে থাকিয়া স্বামীদের সেবা করি।

"আমার স্বামীগণ যে দ্রব্য আহার করেন না তাহা আমি কদাচ

আহার করি না বা স্পর্শ করি না। তাঁহাদের আদেশে আমি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হই। শ্বাশুড়ী ও গুরুজনগণ আমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাই আমি পালন করি। আমার স্বামীরা ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শান্তস্বভাব হইলেও আমি শ্রদ্ধা ও ভয়ের সহিত তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকি।

"হে ভদ্রে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্ম। পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি। স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই গর্হিত। পতির মত দেবতা নারীর আর কেহই নাই। পতিই তাহাদের ধর্ম্ম-অর্থ, কাম-মোক্ষের মূল। তাঁহাদের অতিক্রম করিয়া আমি কখনও শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না। আমি প্রাণান্তে শ্বাশুড়ীর নিন্দা করি না। শ্বাশুড়ীর সেবা না করিয়া জল গ্রহণ করি না, কখনও তাঁহাপেক্ষা উত্তম দ্রব্য গ্রহণ করি না।

"আমি ধর্ম্মরাজের সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব রাখি এবং পোষ্যগণের ভরণ পোষণে ত্রুটী করি না। আমি নিজের বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া সংসারের সমস্ত গুরুভার বহন করিয়া থাকি। সমুদ্র যেমন জগতের সব জলরাশির হিসাব রাখে আমিও সেইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিপুল রাজ্য ও সংসারের হিসাব রাখি।

"সকলে নিদ্রিত হইলে আমি শয্যা গ্রহণ করি ও সকলে জাগ্রত হইবার পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করি এবং সর্ব্বদা সত্যে রত থাকি। সখি! আমি যে প্রকারে স্বামীদের বশীভূত করিয়াছি তাহা সমস্তই তোমায় বলিলাম। তুমি যদি আমার স্বামী সুখে হিংসা কর, এবং আমার মত

হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে চাও, তাহা হইলে আমার মত হইয়া দৈনন্দিন কার্য্য ও ধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ হইও না।

"ভগ্নি! তোমায় উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। তথাপি তুমি যখন সখিভাবে আমায় বিদ্রূপ করিয়াছ তখন প্রত্যুত্তরে সখিভাবেই তোমায় উপদেশ দিতেছি 'স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থল। স্ত্রী—স্বামীর ধর্ম্মের সহায়, কর্ম্মের সঙ্গিনী'।"

দ্রৌপদীর কথায় সত্যভামার চমক ভাঙ্গিল। মনে মনে ভাবিলেন প্রিয়সখীকে না ঘাটাইলেই ভাল হইত। বলিলেন, "ভগিনী! না ভাবিয়া তোমায় ঠাট্টা করিয়াছি বলিয়া ত্রুটী লইও না।" দুই সখীতে এবারে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া সত্যভামা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চিন্তা

গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের পুত্র মহারাজ শ্রীবৎসের গুণের তুলনা নাই। বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও পাণ্ডিত্যে তাঁহার তুলনা হয় না। কালে চিত্রসেনের কন্যা চিন্তার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হইল। গুণে, সতীত্বে চিন্তার সমকক্ষ নাই। বহুকাল পরম সুখে কাটিল।

কিন্তু সুখ চিরদিন সমান থাকে না। স্বর্গে লক্ষ্মী ও শনির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল—কে বড়? মীমাংসার ভার অবশেষে শ্রীবৎসের উপর পড়িল। লক্ষ্মী ও শনি উভয়েই শ্রীবৎসের নিকট আসিলেন।

শ্রীবৎস লক্ষ্মীকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিলেন। শনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। লক্ষ্মী শ্রীবৎসকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—সর্ব্বদাই আমি ছায়ার ন্যায় তোমার পশ্চাতে থাকিব।

শনির প্রতিহিংসা সত্বরই আরম্ভ হইল। তাঁহার কোপে শ্রীবৎসের রাজ্যে হাহাকাব উঠিল। দুর্ভিক্ষে, মহামারিতে রাজ্য প্রায় জনশূন্য হইয়া উঠিল, অগ্নিদাহে সহস্র সহস্র গৃহ ভস্মীভূত হইতে লাগিল। প্রজারা ব্যাকুল ক্রন্দনে তাঁহার নিকটে তাহাদের অবস্থা জানাইতে লাগিল। শ্রীবৎস সব শুনিলেন, সব দেখিলেন এবং নিজেরই বিচারশক্তির ফলে যে আজ সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহাও বুঝিলেন। কিন্তু কোন উপায়ই সম্ভব হইল না! অবশেষে শ্রীবৎস বনগমনই শেষ উপায় বলিয়া স্থির করিলেন।

চিন্তাকে পিতৃগৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—"আমারই দোষে আজ এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তাহার ফল আমি স্বয়ংই ভোগ করি। তুমি আমার সহিত অনর্থক কষ্ট পাইবে কেন?" কিন্তু চিন্তা কিছুতেই স্বীকৃতা হইলেন না। বলিলেন—"তোমার বিপদে আমারও বিপদ, তুমি বনে কত কষ্ট পাইবে আর আমি কি সুখে পিতৃগৃহে রাজভোগে থাকিব? সহস্র কষ্টের মধ্যেও আমি তোমার সঙ্গে থাকিলে পরম সুখে থাকিব।" শেষে একত্র বন গমনই স্থির হইল। মণিমুক্তার একটী পুঁটুলি করিয়া রাজদম্পতী গভীর রাত্রে বহির্গত হইলেন।

শ্রীবৎস ও চিন্তা এক বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন সম্মুখে এক ভীষণ নদী, নদীতে তরঙ্গ উঠিয়াছে।

একখানি জীর্ণ নৌকা অদূরে ভাসিতেছে; তাহাতে একজন মাঝি বসিয়া আছে। নদীপার করিয়া দিবার জন্য শ্রীবৎস তাহাকে আহ্বান করিলেন। মাঝি কহিল, পুঁটুলী ও তোমাদিগের দুইজনকে একেবারে পার করিতে পারিব না। একসঙ্গে দুইটী করিয়া পার করিতে পারি। যদি তোমরা দুইজনে একসঙ্গে যাইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে পুঁটুলী আগে পার কর, কিংবা পুঁটুলী পরে পার করিব। শনির প্রভাবে বিকৃতবুদ্ধি রাজা পুঁটুলী আগে পার করিবার জন্য নৌকায় তুলিয়া দিলেন। নৌকা ছাড়িল। মুহূর্ত্তে মায়া নদী অদৃশ্য হইল। দৈববাণী হইল এ তাঁহারই বিচারশক্তির পুরস্কার। রাজদম্পতী কপর্দ্দকশূন্য হইলেন।

প্রভাত হইল। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি ধীবরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কোন মতেই মৎস্য ধরিতে পারিতেছিল না। শ্রীবৎস তালবেতালসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তাল বেতালকে স্মরণ করিলেন। তাহারা প্রচুর মৎস্য পাইল। সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা একটী মৎস্য তাঁহাদিগকে দিয়া গেল। সেই মৎস্যই সেদিনের একমাত্র আহার্য্য হইল।

সেই মৎস্য দগ্ধ করিয়া চিন্তা তাহা ধৌত করিবার জন্য জলাশয়ে গেলেন। 'রাজভোগে অভ্যস্ত রাজা কিরূপে তাহা ভোজন করিবেন' এই চিন্তা করিতে করিতে চিন্তা জলে নামিয়াছেন, এমন সময় সেই দগ্ধ মৎস্য লাফ দিয়া জলে পলায়ন করিল। সাধ্বী হাহাকার করিতে করিতে শ্রীবৎসের নিকট সব বলিলেন। শ্রীবৎস সব বুঝিলেন। বন্য ফলমূলে কোনরূপে ক্ষুধা নিবারণ করিলেন। এইরূপে বনে কতকাল কাটিল।

অবশেষে কোন নগরে গমনই স্থির হইল। একদিন দুইজনে এক কাঠুরিয়াপল্লীতে উপস্থিত হইলেন। দীনবেশ দেখিয়া কাঠুরিয়াগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিল না। তাহারা সাগ্রহে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল।

মহারাজ শ্রীবৎস এক্ষণে কাঠুরিয়া। তিনি তাহাদের সহিত বনে কাষ্ঠ আনিতে যান, বাজারে বিক্রয় করেন। কাঠুরিয়া স্ত্রীরা চিন্তার গুণে মোহিত হইল। তাঁহার রন্ধন তাহাদের নিকট অমৃত বলিয়া বোধ হইত।

ঘটনাক্রমে একদিন এক সওদাগর নৌকা করিয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। শনির মায়ায় নৌকা সেই কাঠুরিয়াপল্লীর নিকট আসিয়া চড়ায় আটকাইয়া গেল। নৌকা কিছুতেই চলিল না। সওদাগর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। শনি এক গণকের বেশ ধরিয়া সওদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন "যদি কোন সতী আসিয়া তোমার নৌকা স্পর্শ করে তাহা হইলে চলিবে"। সওদাগর উপযুক্ত পুরস্কার দিয়া কাঠুরিয়াপল্লীর সমস্ত স্ত্রীলোককে আনাইয়া নৌকা স্পর্শ করাইলেন। তথাপি নৌকা চলিল না। অবশেষে শনির কৌশলে চিন্তাকে আহ্বান করা হইল। সতী মহা বিপদে পড়িলেন। স্বামী গৃহে নাই, তাঁহার অনুমতি ভিন্ন তাঁহার কোন স্থানেই যাওয়া উচিত নয়। অথচ একজন বিপন্ন, তিনি একবার মাত্র গেলেই সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবে। অনেক আলোচনার পর অবশেষে তিনি নদীতীরে যাওয়াই স্থির করিলেন। তিনি স্পর্শ করিবামাত্রই নৌকা চলিল। সওদাগর মহা আনন্দিত হইল। কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ

বিপদ পাছে ঘটে এই আশঙ্কা করিয়া সওদাগর বলপূর্ব্বক চিন্তাকে নিজের নৌকায় তুলিয়া লইল। নৌকা ভাসিয়া চলিল।

নৌকায় উঠিয়া চিন্তা 'পরিত্রাহি' চীৎকার করিতে লাগিলেন। কোন ফল হইল না। পাপাত্মা সওদাগর হয়ত রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছে এই আশঙ্কায় সতী সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন, যেন তাঁর রূপবিকৃতি ঘটে। দেখিতে দেখিতে চিন্তার অঙ্গে গলিত কুষ্ঠ দেখা দিল। চিন্তা অনাহারে নৌকার একপার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন।

শ্রীবৎস বনে কাষ্ঠ সংগ্রহে গিয়াছিলেন। আসিয়া দেখেন চিন্তা কুটীরে নাই। লোকমুখে চিন্তার অবস্থা শুনিয়া উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে করিতে নদীতীরে ছুটিলেন। নদীর ধার দিয়া বরাবর চলিতে লাগিলেন। যাহাকে দেখেন, তাহাকেই চিন্তার কথা জিজ্ঞাসা করেন।

এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীবৎস সুরভির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সুরভির মুখে চিন্তার সমস্ত অবস্থা শুনিলেন। সুরভি তাঁহাকে সেই আশ্রমে থাকিতে বলিলেন, তাঁহার দুগ্ধধারে মাটী ভিজিয়া যাইত। শ্রীবৎস তাল-বেতালকে স্মরণ করিয়া সেই মাটী দুইহস্তে ধরিতেন। আর স্বর্ণপাট হইয়া উঠিত। এইরূপ তিনি বহুপাট প্রস্তুত করিলেন।

অবশেষে শ্রীবৎসের লোভ উপস্থিত হইল; তিনি সেই সকল বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। নদীতীরে একদিন দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখেন এক সওদাগর বাণিজ্য করিতে যাইতেছে। তিনি তাহাকে আহ্বান করিয়া সেই সকল স্বর্ণপাট লইয়া যাইতে বলিলেন। সওদাগর স্বর্ণপাট সকল নৌকায় লইল। শ্রীবৎসও সঙ্গে চলিলেন।

এত স্বর্ণের লোভ সওদাগর সম্বরণ করিতে পারিল না। সে শ্রীবৎসকে হত্যা করিয়া স্বর্ণরাশি আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইল। হস্তপদ বন্ধন করিয়া সওদাগর শ্রীবৎসকে জলে ফেলিয়া দিল। শ্রীবৎস তাল-বেতালকে স্মরণ করিলেন, তিনি জলে ভাসমান হইলেন। দৈবযোগে সেই নৌকাতেই চিন্তা ছিলেন। তিনি স্বামীর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া একটি বালিশ জলে ফেলিয়া দিলেন। শ্রীবৎস ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। নৌকা চলিয়া গেল।

ভাসিতে ভাসিতে শ্রীবৎস সুবাহু রাজার দেশে গিয়া উঠিলেন। রাজার মালিনীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন। কোনরূপে তীরে উঠিয়া তিনি মালিনীর গৃহে আশ্রয় লাভ করিলেন।

সুবাহু রাজার কন্যা ভদ্রা শ্রীবৎসকে দেখিয়া মোহিত হন। রাজা কন্যার স্বয়ংবর ঘোষণা করিলেন। অনেক দেশ হইতে রাজপুত্রেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রা কাহাকেও মাল্যদান করিলেন না। শ্রীবৎস এক্ষণে রাজজামাতা হইলেন। শ্রীবৎস রাজগৃহে স্থান পাইলেন।

ঘটনাক্রমে সেই সওদাগর সেই স্বর্ণপাট বিক্রয় করিবার জন্য সুবাহু রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইল। শ্রীবৎস সেই স্বণপাট দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। সওদাগরকে চোব বলিয়া বাজার নিকট অভিযুক্ত করিলেন। সওদাগর স্বর্ণপাট নিজের বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেন না। রাজা তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। শ্রীবৎস সমস্ত স্বর্ণপাট নৌকা হইতে আনিতে গিয়া দেখেন চিন্তা সেই নৌকাতেই রহিয়াছেন। পুনরায় উভয়ের মিলন হইল। সূর্য্যের স্তবে চিন্তার রূপলাবণ্য আবার ফিরিয়া আসিল। সুবাহু শ্রীবৎসের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলেন।

শনির প্রভাবেই এই দুর্দ্দশা হইয়াছে বুঝিয়া তিনি শনির স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবৎসেব দুঃখের দিন কাটিল। শুভ দিনে চিন্তা ও ভদ্রাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৎস নিজের রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। রাজ্য আবার সুখৈশ্বর্য্যে হাসিয়া উঠিল।

বেহুলা

বেহুলা নির্ছনি নগরের সায় সদাগরের কন্যা। রূপেগুণে বেহুলা অতুলনীয়া, নম্রতায় আদর্শস্থানীয়া ছিলেন, শিল্পকলায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া কেহ মোহিত না হইয়া থাকিতে পারিত না, সেইজন্য সকলে তাঁহাকে "বেহুলা নাচুনী" বলিয়া ডাকিত। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত বুঝি স্বর্গের কোন অপ্সরী মানুষের দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বেহুলা বিবাহের উপযুক্তা হইলেন।

চম্পক নগরের অধিপতি শৈব চাঁদসদাগরের মনসাদেবীর প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাব ছিল। "চাঁদসদাগর পূজা না করিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হইবে না"—শিবের এইরূপ আদেশ ছিল বলিয়া, মনসাদেবী চাঁদের পূজা পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু চাঁদ কিছুতেই তাঁহার পূজা করিতে সম্মত হইলেন না। মনসাদেবী অবশেষে তাহার প্রতিফল দিবার জন্য চাঁদের বিশেষরূপ অনিষ্ট করিতে লাগিলেন। একে একে চাঁদের ছয় পুত্রকে সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পাতিত

করিলেন ; তথাপি চাঁদ অবিচলিত, কিছুতেই পূজা করিলেন না। লোকের সহস্র উপদেশ, পত্নীর অবিরাম অশ্রুপাত, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। মনসার কোপে শেষে চাঁদের চৌদ্দখানি ডিঙা ধনসহ জলমগ্ন হইল, চাঁদ অতি কষ্টে রক্ষা পাইলেন।

কিছুদিন এই ভাবে কাটিল, অবশেষে চাঁদের আর এক পুত্র জন্মিল, নাম হইল লক্ষ্মীন্দর। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পত্নী কত বুঝাইলেন, চাঁদ কিছুতেই পূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন না। লক্ষ্মীন্দরের ক্রমে ক্রমে বিবাহের বয়স হইল।

নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া ঘটক সায় সদাগরের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেহুলার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। কিন্তু দৈবজ্ঞ চাঁদকে গোপনে বলিয়া গেল বাসরঘরে সর্পাঘাতে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হইবে।

এই বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য চাঁদ সাঁতালি পর্ব্বতে এক লোহার বাসর নির্ম্মাণ করাইলেন। যাহাতে কোন সর্প সেখানে না আসিতে পারে তাহার বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু মনসার আদেশে বাসরনির্ম্মাতা এক সূক্ষ্ম ছিদ্র রাখিয়া গেল, চাঁদ তাহা জানিতে পারিলেন না।

মহা সমারোহে লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ হইয়া গেল। চাঁদ পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া সেই বাসরে রাখিলেন। ক্রীড়া-কৌতুকের পর লক্ষ্মীন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন। বেহুলা জাগিয়া থাকিয়া তাঁহারা পদসেবা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মীন্দর জাগিয়া উঠিয়া ভাত খাইতে চহিলেন, বেহুলা কোনরূপে সেইখানে রন্ধন করিয়া স্বামীকে

খাওয়াইলেন। উভয়ে নিদ্রিত হইলেন, ইত্যবসরে সেই ছিদ্রপথে কালনাগিনী গিয়া লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করিল। লক্ষ্মীন্দর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বেহুলা জাগিয়া দেখেন তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

প্রত্যুষে চাঁদ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া বেহুলার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন, বুঝিলেন লক্ষ্মীন্দর আর নাই। দ্বার উন্মুক্ত হইল, দেখিলেন স্বামীর বিবর্ণ শব ক্রোড়ে লইয়া পূর্ব্বরাত্রের পরিণীতা বালিকা বেহুলা হাহাকার করিতেছে। ক্ষোভে চাঁদ সংসার ত্যাগ করিলেন।

সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে ভেলায় করিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়ার প্রথা ছিল, সুতরাং লক্ষ্মীন্দরকেও ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে ছাড়িয়া থাকিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি মূর্ত্তিমতী দেবীপ্রতিমার মত সেই ভেলায় গিয়া বসিলেন; স্বামীর শব ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। ভেলা গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিয়া চলিল, যেন সহস্র সহস্র লোকের অশ্রু-জলেই ভাসিয়া চলিল।

ভেলা ভাসিয়াই চলিল। কত প্রলোভন, কত বিভীষিকা, কিছুতেই বেহুলার ভ্রূক্ষেপ নাই। স্বামীর শব বক্ষে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বালিকা ভাসিয়া চলিল। কোথায় যাইতেছে জানে না, তবুও তার দৃঢ়বিশ্বাস, স্বামীকে আবার ফিরিয়া পাইবে। ভেলা ক্রমে পচিতে আরম্ভ করিল স্বামীর শব গলিত হইতে লাগিল। একদিন এক বোয়াল মাছে লক্ষ্মীন্দরের এক অঙ্গ কাটিয়া লইয়া গেল। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ও গলিত হইল। এখন নিরূপায়, সেই পূতিগন্ধময় শব বক্ষে ধারণ করিয়া এক মনে বেহুলা মনসা দেবীর স্মরণ করিতে লাগিলেন। সহসা

যেন ভেলা নূতন হইল, স্বামীর শব অবিকৃত হইতে লাগিল, পরিধেয় বস্ত্রও যেন নূতন হইল।

ভেলা ক্রমে নেতা ধোপানীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নেতার একটী দুষ্ট ছেলে তাহাকে বড় জ্বালাতন করিত, সে তাহাকে মারিয়া সমস্তদিন ফেলিয়া রাখিত, অবশেষে কাপড় কাচা শেষ হইলে তাহার মৃতদেহের উপর কয়েক ফোঁটা জল ছড়াইয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইত। বেহুলা কয়েকদিন ধরিয়া ইহা লক্ষ্য করিলেন। একদিন গিয়া সহসা তাহার পদদ্বয় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নেতা বেহুলার মুখে সব কথা শুনিয়া তাহাকে আশ্বাস দিল। নেতা স্বর্গের ধোপানী, দেবতাদিগের নিকট বলিয়া একদিন নেতা বেহুলাকে লইয়া স্বর্গে গেল। স্বামীর কঙ্কাল বক্ষে লইয়া বেহুলা স্বর্গে উপস্থিত হইল।

দেবতারা সকলে বেহুলাকে নৃত্য করিতে অনুরোধ করিলেন। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর জন্য সব করিতে পারেন। স্বামীর প্রাণলাভের আশায় বেহুলা নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে সন্তুষ্ট হইলেন। মনসা দেবীর বরে লক্ষ্মীন্দর প্রাণ পাইলেন। বেহুলার প্রার্থনায় লক্ষ্মীন্দরের মৃত ছয় ভ্রাতাও পুনরুজ্জীবিত হইলেন। বেহুলা স্বামী ও ভাসুরদিগকে লইয়া মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিলেন।

বেহুলা ছদ্মবেশে প্রথমে তাঁহার পিতৃগৃহে আসিলেন পরে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। মৃত পুত্র সকল জীবিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া বনবাসী চাঁদ গৃহে ফিরিলেন এবং মনসার পূজা না করিলে কেহ গৃহে আসিবেন না শুনিয়া চাঁদ মনসার পূজা আরম্ভ করিতে বাধ্য হইলেন। সকলে বাটী আসিলেন। মহা সমারোহে মনসাদেবীর

পূজা হইল, মনসাদেবী আবিভূর্তা হইয়া চাঁদকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মনসার বরে চাঁদের জলমগ্ন ধন রত্নের উদ্ধার হইল। কিন্তু এই আনন্দে এক বিষাদের ছায়া পড়িল। সহসা বেহুলা ও লক্ষীন্দর দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য রথে স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহারা শাপগ্রস্ত অপ্সরা-দম্পতী। মনসার বরে চাঁদ সদাগরও পরে স্বর্গারোহণ করেন।

শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী

এইবারে আমরা বর্ত্তমান সময়ের আদর্শস্থানীয়া এক বঙ্গনারীর পুণ্য-জীবনকাহিনী সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিব। পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষে এখনও সাবিত্রী সীতাদির ন্যায় নারীরত্নের নিতান্ত অভাব নাই। কিন্তু অতীত গৌরবের প্রতি আমাদিগের স্বভাবসুলভ পক্ষপাতবশতঃ আমরা বর্ত্তমানের প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছি। সে কারণে সমসাময়িক ঋষিমহর্ষি বা দেবীতপস্বিনীগণের প্রতি আমরা যেন যথোচিত শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনে অভ্যস্ত নহি।

বিশ্বজননী জগদ্ধাত্রীর অংশে নারীর জন্ম। সে জন্য স্ত্রীমাত্রেই মধুর মাতৃভাব প্রকটিত। নারীচরিত্রের উৎকর্ষ বলিতে আমরা এই মাতৃভাবেরই উৎকর্ষ বুঝিয়া থাকি। আমাদিগের বর্ণনীয়া শ্রীমতী মনো-মোহিনী দেবীর চরিত্রে এই স্নিগ্ধমধুর অমৃত নিস্যন্দী মাতৃভাবের পরি-পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাই। চন্দ্রকিরণের স্নিগ্ধধারাসম্পাতের ন্যায় তাঁহার মাতৃস্নেহ ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল জীবের উপর সমভাবে বর্ষিত। তাঁহার আশৈশব ধর্ম্মানুরাগ, অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি এবং কঠোর তপস্যার ইতিহাস লিখিবার সামর্থ্য লেখকের নাই; তবে তাঁহার দর্শনে যে

অপূর্ব্ব-শান্তিরসে প্রাণ শীতল হইয়া যায়, তাঁহার শ্রীমুখে পরমপিতার প্রতি প্রেম ভক্তি ও বিশ্বাসের বাণী শুনিয়া মহাপাতকীরও হৃদয় আশায় ভরিয়া উঠে, নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে এবং তাঁহার সংসর্গে ও সদুপদেশে শতশত পাপার্ত্ত নরনারী যে নব জীবন লাভ করত সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া শান্তিলাভ করিয়াছে ও করিতেছে—একথার সাক্ষ্য আমরা দিতে পারি।

শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী নবমবর্ষ বয়সে পাবনানিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হয়েন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া প্রতিবেশীরা চমকিত হইতেন। এই হরি-ভক্তি তিনি তাঁহার মাতামহীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার মাতামহী একজন পরম বৈষ্ণবী হরিভক্তিপরায়ণা রমণী ছিলেন। এক দিন সাধ করিয়া তিনি তাঁহার আরাধ্য মৃন্ময় কৃষ্ণমূর্ত্তির চরণযুগল দুগ্ধ দ্বারা ধৌত করিতে গিয়া চরণাঙ্গুলি বিগলিত হইয়া যায়। তদ্দর্শনে 'হায়! কি করিলাম!' বলিয়া গভীরশোকে অভিভূতা হইয়া তিনি সেইদিন অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন।

একদা পুত্রকন্যাসঙ্গে শ্রীমতী মনোমোহিনীর মাতামহী পদ্মানদীপথে নৌকাযোগে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন; এমন সময়ে সহসা বাত্যাবেগে নদীবক্ষঃ উচ্ছ্বাসিত হইলে, তাঁহাদের নৌকা জলমগ্ন হইয়া যায়। এই কঠিন পরীক্ষায় না পড়িলে, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণনির্ভরতা যে কত গভীর ছিল তাহা আমাদের জানিবার কোন উপায় থাকিত না। ঐ নিদারুণ সঙ্কট সময়ে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া "ঠাকুর নিশ্চয় আমাদের রক্ষা করিবেন" এইরূপ আশ্বাসবাণী দ্বারা সকলকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, নৌকা জলমগ্ন হইয়া

গেল, কিন্তু আরোহীরা যেখানে জলে পড়িলেন, সেইখানে মাত্র হাঁটুজল। পুত্র-কন্যাগণকে কোলেপিঠে করিয়া তিনি যেদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সেই দিকে তীর পর্য্যন্ত বরাবর হাঁটুজল। ভক্তের প্রতি ভগবানের এমনি দয়া! বিশ্বাসের এমনি মহিমা!

মাতামহীর নিকট হইতে যে ভক্তি-সাধন তিনি শৈশবেই শিক্ষা করেন, তাহাই ক্রমে ঘনীভূত হইয়া বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার হৃদয়কে সদ্‌গুরুলাভার্থ উদ্বেল করিয়া তুলিল। 'সদ্‌গুরু চাই! সদ্‌গুরু ব্যতীত আমি কেমন করিয়া ভগবদারাধনার দুর্গমপথে একাকী অগ্রসর হইব?' ইত্যাকার চিন্তায় বাল্য ও কৈশোরের ছয় সাত বৎসর বিশেষ উৎকণ্ঠাতেই তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে একদিন গভীর রাত্রে তিনি এক স্বপ্ন দর্শন করিলেন। এক জ্যোতির্ম্ময়-তাপস-মূর্ত্তি প্রেমকরুণ হাসিমুখে তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুই মা বড় ভাগ্যবতী; আমি তোকে নাম দিতে আসিয়াছি, এই নামজপের সাধন করিস্।" এইরূপে বালিকা মনোমোহিনীর স্বপ্নে দীক্ষা হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে তাঁহার নয়নপটে ভাসিতে লাগিল। তদবধি তিনি সেই মূর্ত্তির ধ্যান ও সেই নামের সাধনে প্রবৃত্তা হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার নিকট-কুটুম্ব মেদিনীপুরের বিখ্যাত হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাবনায় আসিয়া তাঁহার বাটীতে কিছুদিন অবস্থান করেন। ঈশ্বরবাবু প্রত্যহ তাঁহার গৃহের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ গোপনে পূজাদি করিয়া থাকেন এবং কাগজপত্র কি বাহির করিয়া দেখেন। মনোমোহিনী দরজার ছিদ্র দিয়া তাঁহাকে

প্রায়ই ঐরূপ করিতে দেখেন। একদিন তাঁহার অনুপস্থিতিকালে কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি ঈশ্বরবাবুর গৃহে প্রবেশ করেন এবং তাঁহার কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে সহসা একখানি ফটো তাঁহার হস্তগত হয়। সেই ফটো দেখিয়াই তাঁহার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। এ যে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট গুরুমূর্ত্তি! ঈশ্বরবাবু গৃহে প্রত্যাগত হইলে, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ফটো কাহার?"

ঈশ্বর। আমার গুরুদেবের।

মনো। তিনি কোথায়?

ঈশ্বর। আগ্রায়।

মনো। তাহা হইলে আমাকে ত আগ্রায় যাইতে হয়।

ঈশ্বর। কেন?

মনো। ইনি যে আমারও গুরুদেব। স্বপ্নে যে আমি ইঁহারই নিকট নাম পাইয়াছি, এবং তদবধি এই মূর্ত্তিই যে আমার আরাধ্য হইয়াছেন।

তাহার পর কত কঠোরতা, কত উগ্র তপস্যা, কত আনন্দ, কত শান্তি, কত প্রেম—তাহা আমি ক্ষুদ্র লেখক কি করিয়া বলিব?

সংসারের দারিদ্র্যের মধ্যে, দিবস রজনী অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে এই অলোকসামান্যা জগজ্জননীরূপিণী ব্রাহ্মণগৃহিণী কিরূপ ধৈর্য্যনির্ভর ভক্তিবিশ্বাসের সহিত সংসার-কোলাহলের মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সাধন করিতেছেন, তাহা বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষের বিষয়। যাঁহাদের আগ্রহ আছে আমরা তাঁহাদিগকে পাবনা সহরের উপকণ্ঠস্থিত হিমাইতপুর গ্রামে গমন করিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া ধন্য হইতে অনুরোধ করি।

শ্রীমতী মনোমোহিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅনুকূলচন্দ্রের ভগবল্লীলা-বিলাসের প্রসঙ্গ এস্থলে অবান্তর কথা। তাঁহার দর্শনমানসে প্রতিদিন

তাঁহার বাটীতে দশ বিশ, পঞ্চাশ ষাট, একশত দুইশত পর্য্যন্ত দূরাগত মুমুক্ষু তাঁহার কুটিরে আতিথ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। মা জননী তাঁহার পুত্রবধূদের সহায়তায় ঠিক মায়ের মত আদরযত্নে এই সকল অতিথিগণের সৎকার করিয়া থাকেন। দরিদ্র সংসার। সামান্য যাহা জমি আছে তাহাতে উৎপন্ন তণ্ডুলরাশির শেষ কণা পর্য্যন্ত সন্তানগণের অন্নসংস্থানে ব্যয়িত হইতেছে। ধনী ও সমর্থ সন্তানগণ অর্থসাহায্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু মা জননী তাহা গ্রহণ করিবেন কেন? জগজ্জননীর যে অক্ষয় ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার, তাঁহার দুঃখ কিসের?

এরূপ বিশ্বাস নির্ভর ও ত্যাগের কথা আমরা আর কোথাও দেখি নাই, শুনিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। দরিদ্র সংসারে এমন "দীয়তাং ভুজ্যতাং" বাস্তবিকই অলৌকিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়াই মনে হয়?

সম্প্রতি, ১৩২৬ সালের গত বৈশাখ মাসে পাবনার সহরতলী কাশীপুর গ্রামে ঝল্লমল্লজাতির উন্নতিকল্পে এক মহতী সভা আহূত হয়। ঐ সভায় মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, মহাপ্রাণ দেশহিতৈষী কর্ণেল শ্রীযুত ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গদেশের বহু জেলা হইতে বহু ঝল্লমল্ল প্রতিনিধি কাশীপুরে আসিয়া এই সভায় যোগদান করেন। দূরাগত লোক-সমাগম এত অধিক হইয়াছিল যে সভার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের বাসাহারের সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সভার প্রথম অধিবেশন-দিবসে রাত্রি দশটার সময় প্রায় একসহস্র ঝল্লমল্ল মা-জননীর উদার বিশ্বপ্রেম ও সন্তান-বৎসলতার কথা শুনিয়া তাঁহার কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় আসিয়া প্রস্তাব করিলেন, "আমরা বাজার হইতে চাল ডাল কিনিয়া

দিতেছি, আমাদিগের আহারের সংস্থান করুন।" মা-জননী বলিলেন, "যদি তোমরা চাল ডাল কিনিয়া দিবার কথা বল, তাহা হইলে 'আমি অপারগ! আর যদি আমার ক্ষুদকুড়া যাহা আছে তাহাতেই তৃপ্ত হও, তাহা হইলে অপেক্ষা কর।"

তখন সেই কুটীরপ্রাঙ্গণে, পদ্মাতীরে মাতাঠাকুরাণী ও বধূমাতাগণ এবং পূর্ব্বদিনের অভ্যাগত সন্তানগণ কোমর বাঁধিয়া বড় বড় চুল্লী প্রস্তুত করিয়া মহোল্লাসে পাকারম্ভ করিয়া দিলেন। এক হাজার লোককে ভোজন করাইতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এইরূপে তিন দিন দুই বেলা চারি শত লোককে খাওয়াইয়া মায়ের আনন্দ দেখে কে?

বিশ্ববাসীর প্রতি যাঁহার অগাধ অপত্যস্নেহ, পর্ণকুটীরে যিনি বিশাল অতিথিশালা গড়িয়া তুলিয়াছেন, সদা কর্ম্মশীলা হইয়াও যিনি নিতান্ত অনাসক্তা, কর্ম্মের মধ্যেই মন যাঁহার সদা সাধননিরত, সহজ অনুভূতি যাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান, প্রেম যাঁহার সর্ব্বত্র সঞ্চারী, ব্যবহার যাঁহার অহংশূন্য, করুণা যাঁহার হিমাচলের ন্যায় স্থির, সুখের বিষয় সেই পুণ্যশ্লোকা জননীমূর্ত্তি অতীতের অতিরঞ্জন বা ইতিহাসের অস্পষ্ট গোধূলির চিত্র নহে, পরন্তু বর্ত্তমান দিবালোকে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূতা।*

---

* বর্ত্তমান হিমাইতপুর গ্রাম একটী মহাপীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে। অনেকেই ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দর্শন লাভ করিতে তথায় গমন করেন। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি ভারতের বহু গণ্যমান্য মহোদয়গণ ঠাকুরকে দর্শন করিতে হিমাইতপুর গিয়াছিলেন। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় দার্জ্জিলিঙ্গে দেহরক্ষা করিবার পূর্ব্বে ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূকে ঠাকুরের পদাশ্রয়ে হিমাইতপুর রাখিয়া যান।

ভারতের নারী

(তৃতীয় ভাগ)

পরিশিষ্ট

ভারতের নারী

৺মৃণালিনী ঘোষ

১। অরবিন্দের পত্র*

প্রিয়তমা মৃণালিনী,

......................সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই দুঃখ দেখা যায়, দুঃখ সর্ব্বদা সুখকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম যে পুত্র কামনার সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল এই। ধীর চিত্তে সব সুখ দুঃখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়।

... ...

এখন সেই কথাটী বলি। তুমি বোধহয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমাব ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের

---

* স্বদেশী যুগের অন্যতম নেতা, ভারত-জাতীয়তার পথ প্রদর্শক ঋষি, ভারত স্বাধীনতার পূণ্যপ্রাণ, নবযুগেব শ্রেষ্ঠ সাধক, যোগীশ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ১৯০৬ সালে এই পত্র গোপনে তাঁহাব স্ত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষকে লেখেন। দৈববলে সেই গোপনীয় পত্র আলিপুরে বোমার মামলাব সময় পুলিসে আদালতে উপস্থিত করে। একখানি পত্রের সাবাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। শ্রীঅরবিন্দ ব্রাহ্মবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, শিশুকাল হইতে বিলাতে শিক্ষিত হইয়াও হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, এবং সুধু ভারতের নহে, জগতের সভ্যতা সাধনার পথ দেখাইয়া দিতেছেন। শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় চিন্তাশীল মনীষী বর্ত্তমানে জগতে বিবল। তাই হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ-নির্ণয় পত্রখানি তাঁহার যৌবনের প্রথমে লিখিত গত হইলেও আমাদের সকলেরই উহা রামায়ণ, গীতা, মহাভারতের ন্যায় পাঠ করা উচিত। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে দুঃখের সংবাদ যে দেবী মৃণালিনী স্বামী সেবায় বঞ্চিতা হইয়া, পরজীবনে স্বামীব সেবা করিবার জন্য স্বামী প্রদর্শিত পথ ধরিয়া সাধনা করিতে করিতে ১৩২৫ সালের ২বা পৌষ ইহধাম ত্যাগ করেন। ভবিষ্যত সংস্করণে এই ঋষিপত্নীর জীবনী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইবে।

উদ্দেশ্য, কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক, অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধহয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহস্র লোকের মধ্যে দশজন অসাধারণ, সেই দশজনের মধ্যে একজন কৃতকার্য্য হয়। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণ ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রীজাতির সব আশা সাংসারিক সুখ দুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না দুঃখই দেয়।

হিন্দুধর্ম্মের প্রণেতৃগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অসামান্য চরিত্র, চেষ্টা ও আশাকে বড় ভাল বাসিতেন, পাগল হোক্ বা মহাপুরুষ হোক্, অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন, কিন্তু এ সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে? ঋষিগণ এই উপায় ঠিক্ করিলেন, তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে বলিলেন, তোমরা অন্য হইতে পতিঃ পরমগুরুঃ, এই মন্ত্রই স্ত্রীজাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিনী, তিনি যে কার্য্যই স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে, তাঁহারই সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য্য নির্ব্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।

এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্ম্মের পথ ধরিবে, না নূতন সভ্যধর্ম্মের

পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ সে তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচ জনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগ্লী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্ম স্কুলে পড়িয়া থাক তবু তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্ব্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে।

আমার তিনটী পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। এ পর্য্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি। জীবনের অর্দ্ধাংশটা বৃথা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পরিবারের উদর পূরিয়া কৃতার্থ হয়।

আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি, ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। ....এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।

কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিনী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা, তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বল্‌ছিলে 'আমার কোন উন্নতি হল না' এই একটা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিলাম, সে পথে যাইবে কি?

দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে, পাগলামীটা এই, যে কোন মতে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে হইবে। আজকালকার ধর্ম্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক! তাহা আমি চাহি না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ

করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমায় অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিতে কোন বাধা নাই, সেই পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কেহ তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না, যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব।

তৃতীয় পাগলামী এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্ত পানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অটল হইয়াছিল। তুমি ন-মাসির কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে কোথাকার বদ্‌লোক তোমার

সরল ভাল মানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভাল মানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আর শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ হোক বা সুপথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবেন। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।

এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি উষার শিষ্য হইয়া সাহেব-পূজা-মন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে? তুমি বলিবে, এই সব মহৎ কর্ম্মে আমার মত সামান্য মেয়ে কি করিতে পারে, আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই সব কথা ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় আছে, ভগবানের আশ্রয় নাও, ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার যে যে অভাব আছে তিনি শীঘ্র পূরণ করিবেন, যে ভগবানের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেয়। আর আমার উপর যদি বিশ্বাস করিতে পার, দশজনের কথা না শুনিয়া আমারই কথা যদি শোন, আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি, তাহাতে আমার বলের হানি না হইয়া বৃদ্ধি হইবে। আমরা বলি স্ত্রী স্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।

চিরদিন কি এইভাবে থাকিবে? আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার করিব, হাসিব নাচিব, যত রকম সুখ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বলে না। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের

জীবন এই সঙ্কীর্ণ ও অতি হেয় আকার ধারণ করিয়াছে। তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস, জগতে ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি সেই কাজ আরম্ভ করি।

তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি অতিমাত্র সরল। যে যাহা বলে, তাহাই শোন। ইহাতে মন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কর্ম্মে একাগ্রতা হয় না। এটা শোধরাতে হইবে, একজনেরই কথা শুনিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য ধরিয়া অবিচলিত চিত্তে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, লোকের নিন্দা ও বিদ্রূপকে তুচ্ছ করিয়া স্থির ভক্তি রাখিতে হইবে।

আর একটা দোষ আছে, তোমার স্বভাবের নয়, কালের দোষ। বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে। লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীর ভাবে শুনিতে পারে না; ধর্ম্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর, যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিদ্রূপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়; ব্রাহ্ম স্কুলে থেকে থেকে তোমার এই দোষ একটু একটু হয়েছে, বারিরও ছিল, অল্প পরিমাণে আমরা সকলেই এই দোষে দূষিত, দেওঘরের লোকের মধ্যে ত আশ্চর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মনের ভাব দৃঢ় মনে তাড়াইতে হয়, তুমি তাহা সহজে পারিবে, আর একবার চিন্তা করিবার অভ্যাস করিলে, তোমার আসল স্বভাব ফুটিবে, পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তোমার টান আছে, কেবলি এক মনের জোরের অভাব, ঈশ্বর উপাসনায় সেই জোর পাইবে।

এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা। কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়া নিজের মনে ধীর চিত্তে এই সব চিন্তা কর, এতে ভয় করিবার

কিছু নাই, তবে চিন্তা করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না। কেবল রোজ আধ ঘণ্টা ভগবানকে ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারি হইবে। তাঁর কাছে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্ব্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই। এটা করিবে ?

তোমার—

২। মায়ের কথা *

আমাদের বাঙ্গলা দেশ শক্তির পীঠস্থান। নারীর এত বড় পূজার তীর্থ কোন দেশে আছে বল ?............ .. ..এমনটী আর কোথায়ও নাই। সতীর প্রেমের গড়া অঙ্গখানি বিষ্ণু চক্রে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া কত স্থানেই না পড়িল, কিন্তু আনন্দময়ীর প্রাণটুকু কিনা জাগিল শুধু বাঙ্গলায়! এদেশে মায়ের জলজলে ভর আছে, এ মাটীর সোনার ধূলা নিছক প্রেমেই গড়া ; তাই সকল দেশের কৃষ্ণ এখানে আসিয়া রাধাশ্যাম, দ্বারকার রাজা এখানে থির বিজুরীলতা'র অঙ্গে নীল মেঘ হইয়া তাহারই সোনার শোভা বাড়াইতেছে। একি কম দেশ! অন্য দেশের তুলসীদাস রামায়ণ গান করে, রামদাস তুকারাম নানক নিরঞ্জনের সহিত সখ্যদাস্যরসে মন মিলায়। আর এই প্রেমের দেশে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সেই কান্তরসের পাগলগুলা বুকের ঠাকুরকে রাধা সাজাইয়া অনন্তের ঠাকুরের সহিত "এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ" সেখানে কি সুধার সাগরে যুগলের মিলন ঘটায়! মায়ের সব জুড়ান কোলটুকু

---

* স্বদেশী যুগের অগ্নিঋষি শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় বিলাতে ইংলণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি আন্দামান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কয়েকটী প্রবন্ধ "মায়ের কথা" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বিলাতে জন্ম গ্রহণ করিলেও গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। এইজন্য প্রবন্ধটী সকলের পাঠ করা উচিত। গ্রন্থকার বর্ত্তমানে মাদ্রাজের পণ্ডিচারী সহরে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে সাধনা করিতেছেন।

পাইবার কামনায় রামপ্রসাদের কেমন মা মা নামে এদেশের মাঠ ঘাট আকাশ বাতাস ভরা! কোন্ দেশের কোন সাধকের হৃদয় কমলে এমন করিয়া "পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী" নাচিয়াছে বল দেখি? কোন চিন্ময়ী মা-টির কোলে জন্মিয়া একাধারে লক্ষ কোটী নারীর সঞ্চিত প্রেম বুকে ধরিয়া এমন আর একটি শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ কোথায় কৃষ্ণনাম লইয়াছে?

কিন্তু নারীর এমন তীর্থ, এমন অনুপম সতীপীঠ বঙ্গভূমে আজ শক্তির যে অবমাননা হইতেছে তাহা আর কোথায়ও নাই। এ আদ্যা-শক্তির দেশে কিনা মেয়ে জন্মিলে ভয়ে ভাবনায় মা বাপের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়!

এমন দেশে কিনা আমরা দাসী বিক্রয়ের ব্যবসায়ী প্রেমের ত্যাগের আপ্রাণ সেবার এমন কমনীয় জীবন্ত বিগ্রহ বাঙ্গালীর মেয়ে তাই আগুনে পুড়িয়া মরে;......................

বাঙ্গালী মাটির দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা গড়িয়া ঢাক ঢোল ফুল চন্দন বিল্বপত্রে জড়রূপার পূজা করে, আর তাহারি ঘরে চিন্ময়ী জীবন্ত শক্তির কত অবহেলা! বাঙ্গালী কাশীতে অন্নপূর্ণা, উত্তরে জ্বালামুখী, ব্রজপুরে শ্রীরাধা ও বঙ্গে আদ্যাশক্তির চরণে গিয়া মাথা খোঁড়ে, আর নিজের আধখানা আত্মশক্তিকে শৃঙ্খলিতা করিয়া তাহার জ্ঞান বুদ্ধি সকল প্রকার অন্তঃপ্রেরণার পথ রুধিয়া আপনি অঙ্গহীন হইয়া থাকে। ......
......যে মা জঠরে ধরিয়া কোলে করিয়া স্তন্য মধু পিয়াইয়া এ জড়দেহ গড়ে, সে জ্ঞানের অমৃতনিষেকে তখনকার কোমল মনটুকু তো গড়িয়া তুলিতে পারে না; যে জীবন-সহচরী আসিয়া অগ্নি দেবতা ব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া একাঙ্গ হয়, সে তো আমাদের

জীবনের যত বড় বড় জগদগামী ভগবৎমুখী ধারাগুলির কোনটিরই সন্ধান রাখে না!

এ পাপ নারীর নহে পুরুষের। তবু দেখ এত অবহেলা এত দৈন্যেও বাঙ্গালীর ঘরে নিঃস্বার্থতা ও সংযমের কি পবিত্র ছবি! ঘরের সকলকে খাওয়াইয়া ক্ষুদ কুঁড়া একমুঠি অন্ন তাহারা খায়, দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমে ও অত সেবায়ও কাতরা হইতে জানে না, বুক পাতিয়া সমস্ত সংসারটুকু জুড়িয়া কেমন শীতল সর্ব্বসন্তাপহারী জুড়াইবার ঠাঁই গড়িয়া রাখে। তাহাদের শাঁখের রবে হুলুধ্বনিতে আজও কত কল্যাণ, তাহাদের আপনা ভোলা শুধু দিবার কাঙ্গাল প্রেমে কত মধু, তাহাদের সতীত্বের মাতৃত্বের পুণ্যে আমাদের মরা দেশে এখনও কত প্রাণ। বাঙ্গালীর মেয়ে আজও অন্য দেবতা ভুলিয়া পতিদেবতার পূজা করিতে জানে, কিন্তু এদেশের পুরুষ তাহার ঘরের দেবীকে চিনে না। ....

তবু আমাদের একদিন সব ছিল। যে দেশের নারী ঋক মন্ত্রের রচয়িত্রী, যে দেশের দর্শন নারীর মুখে বিচারিত, সে দেশের চেয়ে বড় স্ত্রীশিক্ষা আর কোন দেশে ছিল না। স্বামীর নিন্দায়, স্বামীর মরণে, স্বামীর লজ্জায় যে দেশের পতিগত প্রাণার ছিল স্বেচ্ছামরণ, যে দেশের নারী পতির জীবন ব্রতের উদযাপনে অসিকরা রণরঙ্গিণী হইত, সে দেশের বড় সতী আর কোন দেশে নাই। আবার যে দেশের শ্রীরাম-কৃষ্ণের গুরু ব্রাহ্মণী, চণ্ডীদাসের "কাম গন্ধ নাহি যায়" এমন বিশুদ্ধস্বরূপা পূজার বিগ্রহ রজকিনী রামী, সে দেশের মেয়ে যে স্বর্গের অধিক—গঙ্গার বড় মুক্তিপ্রদা।

... ...

ইউরোপ মাটির মেয়ের পূজা করে, ভোগের দাসী ইন্দ্রিয় সুখের পুতুল ও কর্ম্মপ্রেরণার বিগ্রহ লইয়াই তাহার নাড়াচাড়া,......তাহাদের মেয়ে কাম সাধনায় সাধ্য। .....আমাদের মেয়ে ত্যাগ ও বিমল তপস্যার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, তাই একবসনা আভরণহীনা সে স্নিগ্ধ রূপে এত প্রাণ ভোলান মাতৃভাব। নবতন্ত্রের পুরোহিত বিবেকানন্দ তাই বলিয়াছেন, তাহাদের ঘরের মেয়ে রত্ন অলঙ্কারে ভূষায় সাজিয়া মনোহরা পরীটি হইয়া থাকে, আর বাজারের মেয়ে অর্দ্ধনগ্না ; আমাদের ঠিক উল্টা—যত সাজসজ্জা বাহিরে ভোগের দোকানে, ঘরে কিন্তু নিরাভরণা স্নাতা একবস্ত্রা অথচ শ্রীসম্পদে বিভূষিতা কি মধুর রূপ! নারী মায়ের জাতি, তাই সাজিবার জন্য সাজিলে তাহার সব সম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, মেয়ে শক্তির প্রতিমা, বড় সহজে দেবী ; আবার তেমনি সহজে পিশাচী, যখন যে দিকে টানে বড় দুর্দ্দমনীয় বলে টানে, তাই আমার আনন্দময়ীরা মা হইতে জানিলে এতগুলি মানুষ এত সহজে তার ছেলে হয়।

তাই বলি, ওগো শক্তিপীঠের সন্তান বাঙ্গালী! মায়ের বুকের পাষাণ তুলিয়া লও, মাকে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে মায়ের মত মা হইতে দাও ; দেখিবে পটের দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী অন্নপূর্ণা নামিয়া আসিয়া তোমার গৃহ-অঙ্গনে রন্ধনশালায় চণ্ডীমণ্ডপে একাধারে বিরাজ করিবে। তখন দেবীর কোলে দেবতা জন্মিবে, তোমার ঘরের স্বর্গটুকু বাহিরে আসিয়া গ্রাম, নগর মন্দির পণ্যশালা ভরিয়া নবনন্দনকানন রচিয়া তুলিবে, "দেশ জাগো" বলিয়া আর অরণ্যে বসিয়া প্রতিসন্ধ্যায় শেয়াল ডাকিতে হইবে না।

তাই বলি এক কথায় আমাদের সেই চির পুরাতন অথচ নূতন

যুগের মত নূতন করিয়া স্ত্রীশিক্ষা হউক—সেই শ্রী সেই হ্রী আর পূর্ণ মুক্তি। আমরা পুরাতন হইতে গিয়া জ্ঞানে কর্ম্মে মুক্তিতে সকল গভীর ধারায় বঞ্চিতা দাসী গড়িয়া রাখি, আর নূতন হইতে গিয়া গৃহিণীর আসন হইতে ব্রতচারিণীকে তুলিয়া বিবি সাজাই। প্রবীণে নবীনে আমরা সমান তামসিক।

তাই বলি মেয়ে আর ছেলে দুইকে গড়, একজন পড়িলে আর একজন সহব্রতী তাহাকে তুলিয়া ধরিবে ;—জীবন পথ বড় মনোরম বড় সুগম হইবে—সমস্ত যাত্রাটুকু তীর্থের ধূলিতে মনের মিলনে, শুভের মঙ্গল কলসে কদলি স্তম্ভে উৎসব রমণীয় হইয়া উঠিবে।

মেয়েকে মাতৃত্বের গৌরব বুঝাইয়া দাও,—বুঝাও যে অত বড় গৌরব রাজ-রাজ্যেশ্বরীরও নাই। ছেলে কোলে মায়ের মত বর ও অভয়ের অমন ছবি, প্রেম ও নির্ভরের অমন চূড়ান্ত মেলা, স্বর্গ ও পৃথিবীর অমন পাবন সঙ্গমতীর্থ, জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মায়ের কোলের ছেলে—ও তো ছেলে নয়, ও যে দেশ—ও যে পুরাতনের সবটুকু, আবার ভবিষ্যতের আরো কত কি! মাকে তাহার কোলের সেই নন্দনের কুঁড়িটিকে বর্ণে মধুতে গন্ধে শতটি দলের নয়ন রঞ্জন শোভায় স্তন্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মা শুধু শিশুর দেহের মা নয়, তাহার কোমল হৃদয় বৃত্তিগুলির মা, মুকুলিত জ্ঞানের প্রতি-দলটির মা, আত্মার অন্তর্লীন দেবত্বটী অবধি ধরিয়া জীবনের সবটুকুর স্তন্যদায়িনী মা ; পশুর মা আর মানুষের মায়ে এইখানে তফাৎ।

তাই বলি মা হইবার মত করিয়া গড়ার নামই স্ত্রীশিক্ষা। মা গড়িতে গিয়া সবার আগে হৃদয়টি গড়িতে ভুলিওনা ; বহির্জগতের জ্ঞান

দিতে গিয়া মেয়ের বুকের মাঝে পরমার্থের পতিত পাবন তীর্থটি রচিয়া দিও ; জগতের অঙ্গনে মেয়ের নূতন মুক্তির সংসার পাতিতে গিয়া ভারতের সতীর গৌরব ও মায়ের স্বর্ণ আসন তাহাকে দেখাইয়া দিও। তবেই স্ত্রীশিক্ষা সার্থক হইবে।...............

৩। মা ভৈঃ

চারিদিকে সাড়া পড়ে' গেছে, "নারী জেগেচে," ভারত উদ্ধারের আর বেশী দেরী নেই ; আমি কিন্তু দেখ্‌ছি, "নারী রেগেচে", তা'র সঙ্গে ভারত উদ্ধারের কোন সম্বন্ধই নেই। কেউ কেউ বলবেন—রেগেই যদি থাকেন—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানুষ ত রাগতে পারে না, অতএব আদৌ জেগেছেন, পশ্চাৎ রেগেছেন, এমন ত হ'তে পারে? হাঁ তা পারে ; কিন্তু অনুগ্রহ করে' যদি নিদ্রাই ভঙ্গ হ'য়ে থাকে ত রেগে কি লাভ?

সতী একবার রেগেছিলেন—আশুতোষের অনুনয় উপেক্ষা করে', দশমহাবিদ্যার বিভীষিকা দেখিয়ে তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে', পিতৃগৃহে অনাহূত হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন—ফল হয়েছিল পিতার অজমুণ্ড, যজ্ঞপণ্ড, পরে আপনার দেহপাত। তারপর প্রেমময় পাগল স্বামীর স্কন্ধে ঘূর্ণায়মান শবদেহ দিক দিগন্তে ছড়িয়ে চতুঃষষ্টী পীঠস্থানের সৃষ্টি ; কিন্তু ধ্বংসলীলার সেইখানেই অবসান হয়নি—প্রত্যাখ্যাত স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষায় গিরিরাজগৃহে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ, এবং

পরিত্যাগের পর পুনর্মিলন হ'য়ে তবে সে নাটকের পরিসমাপ্তি হয়েছিল। তবে তফাৎ এই, সব স্বামী ভাঙ্গড়ে ভোলা নয়, এমন কি আফিমখোর কমলাকান্ত পর্য্যন্ত নয়। অতএব এ রাগের ফল কি হবে তাই লোকে ভেবে আকুল হচ্চে।

... ...

মা সকল যে সব প্রশ্ন নিয়ে রেগেচেন বা জেগেচেন, যাই বলুন, তার মধ্যে মূল হচ্চে—সাম্য—স্ত্রী ও পুরুষের সমানাধিকরণ equality of the sexes. এই equality বা সাম্য, আপাততঃ এমনই ন্যায় সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত বলে' মনে হচ্চে যে, সে সম্বন্ধে যে কোন তর্ক চল্‌তে পারে তা মনেই আসে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য মাত্র এক হিসাবে আছে—স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই genus homo এই পর্য্যায়ভুক্ত; তা ছাড়া, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সমতা নেই বল্লেই হয়—সামাজিক বা পারিবারিক unit হিসাবে স্ত্রী পুরুষ দু'টী ভিন্ন জীব।

ভিন্ন হ'লেই ছোট বড় হ'তে হবে, তা'র কিছু মানে নেই; বোম্বাই আম আর মর্ত্তমান কলা, দু'টা ভিন্ন ফল,—কিন্তু কে ছোট কে বড়, ও প্রশ্নের কোন মানেই হয় না; ১০৲ টাকায় একমণ চাল,—১০টা টাকা, আর ১ মণ চাল, দুই তুল্য মূল্য হ'তে পারে, কিন্তু দু'টা একবস্তু নয়। এতএব দেখা যায়, ভিন্ন হ'লেও তুল্য মূল্য হ'তে পারে, কিন্তু তুল্য মূল্য বলে এক বা সমধর্ম্মী নাও হ'তে পারে। স্ত্রী ও পুরুষ সম্বন্ধে সেই কথা—ভিন্ন ধর্ম্মী বলে' কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নয়; তুল্য মূল্যই যদি হয় তা হ'লেও এক নয়।

স্ত্রী ও পুরুষ তথাপি সমান, যদি মা সকল একথা বলেন, তা হ'লে

আমাকে বলতেই হবে, মা সকল "রেগেছেন," জেগেছেন একথা বল্‌তে পারব না।

তারপর স্বাধীনতার কথা; মা সকলের আবদার এই,—কেন স্ত্রী পুরুষের অধীন হ'য়ে, আজ্ঞাবাহী পুতুলনাচের পুতুল হয়ে থাকবে। এখানেও আমি "রাগার"ই লক্ষণ দেখতে পাই "জাগার" লক্ষণ দেখ্‌তে পাই না। প্রথম কথা, গৃহস্থলীটা প্রাচীন Sparta রাজ্যের মত যুগ্ম রাজার রাজ্য হবে, না এক রাজার রাজ্য হবে? দুইএ এক না হ'য়ে গিয়ে, দুইজন (স্ত্রী ও পুরুষ) "স্বতন্ত্র উন্নত" হ'য়ে গৃহস্থলীকে যদি Democratic নীতি অনুসারে শাসন করতে চান, তাহ'লে রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়েই বেশী সুখশান্তি লাভের আশা করা যায়। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায়, যে অধিকাংশ স্থলে একের প্রাধান্যই বলবান হ'য়ে ওঠে—তা সেটা স্ত্রীরই হ'ক, বা পুরুষেই হ'ক, অথবা স্ত্রী পুরুষ দুইএ মিশে এক হয়েই হ'ক; কিন্তু যেখানে Dual sovereignty সেই খানেই বিরোধ ও পরে বিচ্ছেদ। মা সকলের এটাও দেখা উচিত যে ঘরের বাইরে এই পরাধীন দেশে, পুরুষ বেচারী যে স্বাধীনতা উপভোগ করে, তা'র চেয়ে কিছু কম স্বাধীনতা স্ত্রীগণ অন্তঃপুর মধ্যে উপভোগ করেন না।

তবে মা সকলের পুরুষের উপর বড় বেশী আক্রোশ এই জন্য যে, পুরুষ ব্যাভিচারী হ'লে তা'র সাতখুন মাপ, কিন্তু রমণীর ক্ষণিক দুর্ব্বলতার জন্য একটু পদস্খলন হলেই, সে বেচারী চিরদিনের জন্য দাগী হ'য়ে গেল, তা'র এতটুকু অপরাধেরও মার্জ্জনা নেই। মা সকলের একথাটা একটু খোলসা করে বুঝতে চাই। পুরুষের পক্ষে আইনটাকে খুব

কত্রা করে দেওয়া যদি তাঁদের অভিপ্রায় হয়, তা'তে আমার আপত্তি নেই, আমি বরং তার খুব পরিপোষণ করি। কিন্তু পুরুষের বেলা আইনটা যেমন আল্‌গা, নারীর বেলাও, সমানাধিকরণের নিয়মে, তেমনি আল্‌গা কেন হবে না—মা সকলের যদি এই অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে নারী রেগেছে বলব না ত কি? আর রাগের সঙ্গেই বুদ্ধিনাশ, আর তারপর বিনাশ।

সাম্যবাদী বা বাদিনীরা যাই বলুন আর যাই করুন, ব্যাভিচারের যদি পারিবারিক পরিণাম কল্পনা করে দেখা যায়, তা হ'লে সে পরিণামকে কিছুতেই সমান বলা যায় না;

... ...

স্ত্রীগণের স্বাধীনতা লাভের উপায় হিসাবে বলা হয়েছে যে, তাঁরা নিজের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখুন, অর্থাৎ নিজে নিজে উপায়ক্ষম হ'ন, এবং তদনুযায়ী বিদ্যা বা শিল্প শিক্ষা করুন। কমলাকান্তের গৃহ শূন্য—সে হাত পুড়িয়ে রেঁধেই খেয়ে থাকে, তবুও আমার পুরুষ ভ্রাতাগণের পক্ষ হ'তে এইমাত্র বলবার আছে যে, এই দারুণ আক্রাগণ্ডার দিনেও, পুরুষ একক কষ্ট করে'ও, কোন দিন এপর্য্যন্ত তা'র গৃহিণীকে বলে'নি—"আর পারিনা, তুমি তোমার পেটের অন্ন গতর খাটিয়ে সংস্থান করে' নাও।" পুরুষের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে যদি নারী গতর খাটাতে চায় ত সেটা ভালই বল্‌তে হ'বে; কিন্তু যদি ঐটে অছিলে মাত্র করে' নিজের স্বাতন্ত্র্য লাভের পথ পরিষ্কার করে' নিতে থাকে, তা হ'লে পুরুষ বেচারীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া হবে।

তারপর মা সকল একবার ভেবে নেবেন যে, একবার গতর খাটাতে বেরিয়ে পড়লে, আর স্ত্রী-শিল্প আর পুরুষ-শিল্প বলে' কোন পার্থক্য থাকবে না। ব্যাঙ্কের দাওয়ান থেকে আরম্ভ করে' কোদাল পাড়া পর্য্যন্ত. সবই করতে হবে। যে দেশ থেকে স্ত্রী স্বাধীনতার ঢেউ এদেশে উপস্থিত এসে লেগেছে. সে দেশে factory girl থেকে আরম্ভ করে' ছুতার, রাজমিস্ত্রি ; Chauffeur, গাড়োয়ান, মেয়েরা সব কাজই কচ্চে, আবার Member of Parliamentও হয়েচে। স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদে কার্য্যের ভেদাভেদ হয় নি, এবং স্ত্রী "স্বাধীন বলে' পুরুষের অধীনতা পাশ থেকে একেবারে মুক্ত হ'তেও পারে নি।

কেন পারেনি তা'র কারণ বলচি। স্বাধীনতা ও সাম্য ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে. সেটার নাম—মৈত্রী। এই মৈত্রীর ক্ষুধা, কি পুরুষ কি স্ত্রী, উভয়েরই হৃদয়ে চিরদিন আছে ও থাকবে ; স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবী অপ্রাকৃত, অলীক—কিন্তু মৈত্রীর আহ্বান তাদের প্রকৃতির নিভৃত কন্দর থেকে চিরদিন প্রতি মূহূর্ত্তে ধ্বনিত হচ্চে, সে আহ্বানকে কানে তুলা দিলেও, শুনতে হ'বে, কেননা সেটা বাহিরের আহ্বান নয়—সেটা ভিতরের ডাক।

৪। "বাবামেয়ে"

……সোজা কথায়—মেয়েমুখো পুরুষ আর মদ্দা মেয়েমানুষ এদুটা কথাই গালাগাল।

মানুষ অর্থাৎ পুরুষ মানুষ নারীকে, অবলা, দুর্ব্বলা, weaker vessel, ইত্যাদি উপাধি দিয়ে তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু নারী, নারী হিসাবে, কোনদিনই অবলাও নয়, দুর্ব্বলাও নয়, weaker vesselও নয়। আমি প্রবলা, হরবোলা, হিড়িম্বা বহুত দেখেছি। তবে ও সকল খেতাব যে নারীকে দেওয়া হয়েছে তার ভিতর একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে। পুরুষ নারীকে যা করতে চায় বা যেরূপ দেখতে চায় তদনুরূপ উপাধিই দিয়ে থাকে। 'নাই' বল্লে শুনেছি সাপের বিষও থাকে না। তোমার বল নাই, বুদ্ধি নাই, তেজ নাই ইত্যাদি শুনতে শুনতে নারী বাস্তবিকই অবলা, দুর্ব্বলা হয়ে যাবে এই দুষ্ট অভিপ্রায়েই পুরুষ নারীকে ঐ সকল সুশোভন অভিধান দিয়ে থাকে। নারী প্রকৃত পক্ষে কোন দিনই অবলা নয়।

তাবলে' নারী পুরুষও নয়, পুরুষের অসম্পূর্ণ সংস্করণও নয়। ……

মনু যাজ্ঞবল্ক্য হ'তে আরম্ভ করে মেকলে পর্য্যন্ত সকল সংহিতাকার অপরাধ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ বিভাগ করেননি;……

কিন্তু জীবন্ত পুরুষ ও জীবন্ত নারী দুইটা স্বতন্ত্র জীব; দুইটার স্বতন্ত্র ধর্ম্ম; সে ধর্ম্ম যিনি স্ত্রীকে স্ত্রী করেছেন, পুরুষকে পুরুষ করেছেন তিনিই নির্ণয় করে দিয়েছেন; তাদের শরীর মন সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের অনুযায়ী ক'রে গড়েচেন। নারী যদি পুরুষ সুলভ গুণের বা কার্য্যের

অধিকার চায়, সেটা নারীস্বভাবের বিকার বা অস্বাভাবিক পরিণতি বল্‌তেই হবে।

এদেশে পুরুষ চিরদিন রমণীকে মাতৃআখ্যা দিয়ে এসেছে, সেটা ঠিক্ নিছক courtesy নয়, কেননা স্ত্রীর স্ত্রীত্ব আর মাতৃত্ব একই কথা, আমাদের দেশের এই সনাতন ধর্ম্ম। ইউরোপের অন্য কথা।......... সিগারেট মুখে বা বাঁধা হুঁকা হাতে ক'রে বসলে (পরমহংস দেব যাই বলুন) মা না বলে বাবা বলাই কি ঠিক্ মনে হয় না কি ?

স্বধু ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদিতেই যে মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে যাচ্ছে তা নয়; অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনায় মাতৃহৃদয় শুষ্ক হ'য়ে গিয়ে সন্তান ধারণ ক্ষমতা লোপ পেয়ে, গৃহস্থালি পরিচালনোপযোগী বৃত্তি সকল শুকিয়ে গিয়ে, ইউরোপে একটা তৃতীয় Sex সৃজন হচ্ছে।...... আমি বেশ দেখ্‌চি, যে নারীর মাতৃত্বের বিকাশ না হ'লে বা তা'র অবকাশ না পেলেই, সে পুরুষের কোটে এসে জুড়ে বস্‌তে চায়,...... ঘর ও বাহিরের মধ্যে যে প্রাচীর, তা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য হাতিয়ার সংগ্রহ কর্‌তে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার বক্ষে শিশু মা ব'লে তার মাতৃত্ব জাগিয়ে তোলে, তখন তা'র পুরুষত্বের দাবী (যাকে সে মনুষ্যত্বের দাবী ব'লে মনে ক'রে) কোথায় ভেসে যায়। লণ্ডনের পথে পথে যখন Suffragetteরা হৈ হৈ ক'রে অতি-অশোভন ভাবে তা'দের মানুষত্বের দাবী ঘোষণা ক'রে গগন ফাটাচ্ছিল, আমি বলেছিলাম—হে ইংরাজ, মা সকলকে ঘরবাসী কর, স্বামীর সোহাগ আর সন্তানের মুখ চুম্বনের ব্যবস্থা ক'রে দাও, মা সকলের মাতৃত্বের অমিয় উৎস খুলে দাও, মা সকল আপনার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, পথ দেখিয়ে দাও। কিন্তু

ইংরাজ সমাজ সে দিকে গেলনা ; তা'র উপর লোক বিধ্বংসি সমর বহ্নি তা'দের যৌন সংহতি লেহন ক'রে নিয়ে গেল ; সে ব্যবস্থা আরও সুদূর পরাহত হয়ে গেল। তাই আজ নারীর নারীত্বের নামে পুরুষের স্বাধিকার মধ্যে হানা পড়ে গেছে। তার ঢেউ এখানেও এসে পৌছেচে। আমি দেখেছি বিলাতে যেমন স্বামী মিলেনা বলে স্ত্রীগণ পুংধর্ম্মী হ'য়ে উঠে ; আমাদের দেশে স্বামী মিললেও যেখানে স্বামী সুখ মিললনা, বা সন্তানের কাকলিতে গৃহদ্বার মুখরিত হ'য়ে উঠল না, প্রায় সেইখানেই মনটা হঠাৎ বহির্ম্মুখ হয়ে উঠে, হালফ্যাসান মত কথায় দেশসেবা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদির দিকে মনটা ছুটে বেরিয়ে পড়ে। প্রসন্নর একটী বিড়াল আছে, সে কখন কখন আমার দুধে ভাগ বসায়, সেটাকে প্রসন্ন বড় ভাল বাসে ; প্রসন্নর সে মার্জ্জার প্রীতি, আমি বুঝতে পারি, তা'র বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয়ের সন্তান প্রীতিরই রূপান্তর আর কিছু নয়। অনেক স্ত্রীসুলভ বাতিক (Hobby) তাঁদের হৃদয়ের কোন না কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত শূন্য কন্দর পূর্ণ করার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

রমণীর এই মাতৃত্ব অর্থাৎ স্ত্রীত্ব বজায় রাখ্‌বার জন্য, সূক্ষ্মদর্শী হিন্দু শাস্ত্রকার কন্যা মাত্ররই বিবাহ অর্থাৎ স্বামী সম্পর্কের ব্যবস্থা ক'রে-ছিলেন। Courtship বা flirtationএর অনিশ্চিত জুয়া খেলার উপর যৌন সম্মিলনের ইমারত তোলবার ব্যবস্থা করেন নি। ইউরোপীয় কুমারীগণ অনেক সময় সেই flirtation অর্থাৎ বন্ধু সম্মিলন বা বঁধু সম্মিলনের "বিষম ঘুরণ পাকে" হাবুডুবু খেয়ে হাঁপিয়ে উঠে। মাতৃত্বে তথা মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে, বিদ্রোহী হয়ে উঠেচেন।

আমি আই বল্‌ছি—মা সকল, মা হও। Council বল, court বল, সভা বল, সমিতি বল, বক্তৃতা বল, বৈচিত্র হিসাবে খুব অভিনব হ'লেও, ওসব পন্থা, মা হওয়াব আগে নয়। "বাবামেয়েব" দল পুষ্টি ক'রে সংসারেব সর্ব্বনাশ কবোনা, দেশেব সর্ব্বনাশ কবোনা। আমি বলে বাখলুম—পুরুষ পুরুষ, স্ত্রী স্ত্রী, the twain shall never meet. *

---

* "মা ভৈঃ' ও "বাবা মেয়ে" প্রবন্ধ দুইটীর লেখক এযুগের কমলাকান্ত। তাঁহার পত্রাবলীর ভিতর হইতে প্রবন্ধ দুইটীর আংশিক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রবন্ধ লেখক অজ্ঞাতনামা হইলেও চিন্তাশীল সমালোচক। ইঁহার প্রবন্ধগুলি নবযুগের সকলেরই পাঠ কবা উচিত।